স্বাধীন বাংলায় দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
রনি

দস্যু বনহুর সিরিজ

স্বাধীন বাংলায় দস্যু বনহুর-৫৭

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

হলুদ খালি ঘাঁটি।

মুক্তি বাহিনী জোয়ানগণ বিপুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের হাসান ভাই এর। আজ সে ফিরে আসবে তাদের মধ্যে।

হলুদ খালি ঘাঁটি সাজানো হয়েছে গাছ-পালা আর ফুল পাতা দিয়ে। মুক্তি যোদ্ধা তরুণদের হাতে হাতে মালা ঝুলছে। শুধু আজ নয় কয়েকদিন হলো তারা তাদের ক্যাপ্টেন হাসেনের জন্য প্রতিক্ষা করছে। আজ তাদের প্রতিক্ষা স্বার্থক হবে।

এক সময় একজন মুক্তি যোদ্ধা তরুণ আনন্দ ধ্বনি করে ছুটে এলো—হাসান ভাই এসেছে...হাসান ভাই এসেছে...সবাই হাসানকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলো।

হাসান এসে দাঁড়ালো মুক্তি বাহিনীর ছেলেদের মধ্যে। হাস্যউজ্জ্বল দীপ্ত মুখখানা আজ অপূর্ব সুন্দর লাগছে।

মুক্তি যোদ্ধা বীর তরুণরা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। হাসান সকলের সঙ্গে করমর্দন করে। যদিও মুক্তি যোদ্ধাগণ সবাই জানে ক্যাপ্টেন হাসান এতোদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলো কিন্তু সে কোথায় কি ভাবে ছিল জানার জন্য সবাই ব্যাকুল। হাসান বুঝতে পারে মুক্তি যোদ্ধা তরুণদের মনোভাব। সে প্রথমে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায়, সবাইকে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তারপর বলে—আজ আমরা বহু ত্যাগ তিতিক্ষার পর দেশকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। শত্রু আজ পরাজিত, বাংলার মানুষ আজ জয়ী। সত্যি আজ-বড় আনন্দের দিন, বড় খুশির দিন কিন্তু এ আনন্দ আমরা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারছি না কারণ খান সেনাগণ বাংলাকে একেবারে অন্তঃসার শূন্য করে রেখে গেছে। সোনার বাংলা এখন একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, অসহায় সম্বলহীন।

মুক্তি যোদ্ধা তরুণগণ সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো—তাদের হাসান ভাই-এর কথা।

হাসান তখন বলে চলেছে—বাংলার এই স্বাধীনতায় বহু মা হারিয়েছেন তার সন্তানকে, বহু ভগ্নী হারিয়েছে তাদের ভাইকে। বহু স্ত্রী হারিয়েছেন

তাদের প্রিয়তম স্বামীকে। কোন দেশের স্বাধীনতায় এতো রক্ত ক্ষয় হয়নি, যত রক্ত ক্ষয় হয়েছে বাংলার স্বাধীনতা আনতে। বাংলার এমন কোন পরিবার নাই যে পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। প্রত্যেকটা পরিবারকে দিতে হয়েছে ত্যাগ-দিতে হয়েছে রক্ত। গত দীর্ঘ নয়টি মাস বাংলার বুকে খান সেনারা যে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ছিলো কোন ইতিহাসে তার নজির নাই। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে বেয়োনটের আঘতে বিদ্ধ করেছে। মায়ের উপর চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার।

থামলো বনহুর মুখমণ্ডল তার রাগে ক্ষেভে রক্তের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। অধর দংশন করে বললো সে—বাংলার প্রায় দু'লক্ষ নারীর ইজ্জৎ তারা লুটে নিয়েছে। আজ সে সব নারী, সে সব মা বোনদের অনেকেই এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া বিসর্জন দিয়ে চির বিদায় নিয়েছে, আত্মহত্যা করে তারা নিজেদের অভিশপ্ত জীবন শেষ করে দিয়েছে। যারা আছে তারা এখন সমাজে নিজেদের হেয় ঘৃণ্য মনে করে বেঁচে আছে কারণ অনেকেই খান সেনা বাহিনীর দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা।

বনহুর রুমাল দিয়ে মুখ খানা মুছে নিলো, তারপর আবার বলতে শুরু করলো—আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এই সব মা বোনদের সমাজে সসম্মানে স্থান দেওয়া। কারণ এরা বাংলার স্বাধীনতায় সব চেয়ে বেশি এবং বড় আত্মত্যাগ দিয়েছেন। একটি অনুরোধ আমি করবো তোমাদের কাছে। তোমরা যারা বিবাহ যোগ্য তারা এই সব বোনদের গ্রহণ করতে কোন সময় দ্বিধা বোধ করবে না। এদের বরণ করে তুলে নেবে ঘরে, ঘরের লক্ষী হিসাবে। দেখবে সমাজ আর সমাজ পতিদের মুখ কালো হয়ে যাবে, তারা শিক্ষা পাবে তোমাদের কাছে। বলো তোমরা রাজি আছো আমার প্রস্তাবে?

সবাই নীরব। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তি যোদ্ধা তরুণরা।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে আবার—ভেবে দেখো এরা তোমাদেরী বোন। তুমি যদি আর জনের বোনকে সচ্ছমন নিয়ে গ্রহণ করো তা হলে তোমার বোনকেও আর একজন গ্রহণ করবে সানন্দে। তোমরা প্রত্যেকেই যদি এসব লাঞ্ছিতা নির্যাতীতা মহিলাদের সমাজে তুলে নাও তাহলে আমাদের সমাজ হবে নতুন এক সৃষ্টি। বলো তোমরা পারবে এদের গ্রহণ করতে?

এবার মুক্তি বাহিনীর তরুণরা বলে উঠে— পারবো।

সাবাস। তোমরা বাংলা মায়ের আদর্শ সন্তান। হা যুদ্ধ আমাদের শেষ হয়েছে কিন্তু সংগ্রাম আমাদের শেষ হয়নি। দুই শত বছর ইংরেজের গোলামীর পর আমরা পেয়েছিলাম পাকিস্তান, ভেবেছিলাম আমরা এবার মানুষের মত বাঁচতে পারবো; এতো বেশি কিছু আমরা আশা করে ছিলাম না, দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাবো। পরার বস্ত্র জুটবে। স্বাধীনভাবে পথ চলতে পারবো, সচ্ছভাবে কথা বলতে পারবো, কিন্তু কি পেয়েছিলাম আমরা'! বাংলার মানুষ কি পেটপুরে খেতে পেয়েছে, তারা কি লজ্জা নিবারণের জন্য পেয়েছিলো বস্ত্র? পায়নি, যা পেয়েছিলো তা তাদের জন্য যত সামান্য মাত্র। বাংলার মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে রৌদ্রে পুড়ে যে ফসল উৎপাদন করেছে তা তারা ভোগ করতে পারেনি? ভোগ করেছে যাঁরা তাঁরা হলেন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি। ইংরেজের পরিবর্তে এলো পশ্চিমা শাসক-গোষ্ঠি। শুধু হাত বদল হলো মাত্র। আবার চললো শোষণ আর শাসন সোনার বাংলার বুকে যে সোনার ফসল জন্মে তার তিন ভাগ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে আর এক ভাগ থাকে বাংলার মানুষের জন্য। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি দিন দিন ফেঁপে উঠতে লাগলো, যেমন আংগুল ফুলে কলা গাছ হয়। বাংলার মানুষ এতো পরিশ্রম করেও পেট পুরে দু'বেলা দু'মঠো খেতে পায়নি, পায়নি তারা মাথা-গুঁজে থাকার আশ্রয়। বাংলার যারা আসল সন্তান তারা কুঁড়ে ঘরে রোদ বৃষ্টিতে ভিজে কোন রকমে জীবন ধারণ করেছে আর একদল পুঁজি পতি তাদেরই বুকের রক্তে ফলানো ফসলের অর্থে সুউচ্চ অট্টালিকায় বৈদ্যুতিক হাওয়ায় বেহেস্তের শান্তি উপভোগ করে চলেছে। শুধু তাই নয় যারা দেহের রক্ত উজার করে হাড় গুড়ো করে জমিতে ফসল ফলিয়েছে তারাই খেতে পায়নি, ধুকে ধুকে মরেছে ক্ষুধায়। অসুখে ভুগেছে এক ফোঁটা ঔষধ জোটেনি অথচ সেই সব পুঁজি পতি আর পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির ঘরে ঘরে উৎসব আর পার্টির ছড়া ছড়ি। তাদের ভোজের আয়োজনে ব্যয় হয় হাজার হাজার টাকা। আর এক মুঠি অন্নের জন্য মাথা কুটে মরে বাংলার মানুষ। অন্যায় অবিচার কোন দিন স্থায়ী হয়না; হতে পারে না। তাই বাংলার মানুষ উঠলো ক্ষেপে, তারা আর নীরবে শোষণ আর শাসন মানতে রাজি নয়। বাংলার মানুষের ধমনির রক্তে আগুন জলে উঠলো প্রতিবাদ করলো তারা। তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। দীর্ঘ চব্বিশ বছর তারা পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর শাসন মেনে এসেছে। ভেবেছিলো একদিন তাদের সুদিন আসবে হয়তো তারা পাবে বাঁচার অধিকার। কিন্তু তা

পায়নি আর পায়নি বলেই তারা ক্ষেপে গেলো। শুরু হলো সংগ্রাম থামলো বনহুরের মুখমণ্ডলে মুক্তা বিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছিলো, প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল খানা বের করে মুখের ঘাম মুছে নিলো তারপর বললো—প্রচুর রক্ত ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের শেষ হয়েছে এবার আর একটি সংগ্রাম সে সংগ্রাম হলো এই বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার সংগ্রাম। সোনার বাংলা যেন সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হয় এখন তোমাদের সকলের সেই দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দেশের প্রতিটি মানুষ যেন আদর্শভাবে নিজেদের পরিচালিত করে, তাহলে দেশ ও একটি আদর্শ সার্বভৌম দেশ হিসাবে গড়ে উঠবে। তখন আমাদের রক্ত দান হবে স্বার্থক। বনহুর এবার বাংলার বীর সন্তান মুক্তি যোদ্ধাদের কয়েক জনের নাম ধরে বললো—

—হীরা, রুস্তম, মাহবুব, হামিদ, কাসেম, খালেক, মাসুদ, মহসীন তোমরা এবার তোমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাও। তোমাদের পড়াশুনায় মনোযোগ দাও এবং লেখাপড়ার মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজ করে যাও। হাঁ এখনও বাংলার মানুষের মধ্যে অনেক অমানুষ লুকিয়ে আছে, যারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। তারা যাতে আর ছোবল মারার সুযোগ না পায় সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

বনহুর থামলো, বললো আবার—তোমরা শপথ নাও দেশ গড়ার কাজে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন বঙ্গ বন্ধুর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুর উপর।

সবই এক সঙ্গে বলে উঠলো—শপথ নিলাম দেশ গড়ার কাজে আমরা আত্নদান করবো যেমন আত্মাহুতি দিয়েছি বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে।

সাবাস। তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তোমরা যদি আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠো তা হলে সোনার বাংলা পৃথিবীর মধ্যে এক মহান দেশ হিসাবে পরিচিত হবে। আজ তাহলে এখানেই—

সবাই বলে উঠে—না আমরা আরও কিছু শুনতে চাই হাসান ভাই। আমরা জানতে চাই, আপনি এতোদিন কোথায় কোন কজে ব্যস্ত ছিলেন।

বনহুর একটু হাসলো তারপর আনমনে কি যেন ভাবলো—হাঁ বলবো সব বলবো তোমাদের কাছে। সেদিন তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম সোজা পশ্চিম বাংলায়। দেখলাম ভারত্ জননী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা দেশের শত্রু পশ্চিমা হানাদারদের সায়েস্তা করার জন্য তাদের বিমান বাহিনীকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমিও বিমান বাহিনীর দলে যোগ

দিলাম। অবশ্য এ জন্য আমাকে অনেক চেষ্টা নিতে হয়েছে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। বিমান চালনা আমি পূর্ব হতেই জানতাম। এর পূর্বেও আমাকে একবার বিমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিলো। হাঁ সে জন্যই আমার কোন অসুবিধা হলো না।

মুক্তি যোদ্ধাগণ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে তাদের হাসান ভাই-এর মুখের দিকে। অবাক হয়ে শুনছে তার কথাগুলো। হাসান ভাই বিমান চালনা করতে পারে কম কথা নয়।

বনহুর বলে চলেছে—ভারতীয় বিমান চালকদের সঙ্গে আমিও বোমারু বিমান নিয়ে বাংলার আকাশে ফিরে এলাম। তারপর চললো বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য ছিলো হানাদারদের ধ্বংস করা। খান সেনা বাহিনীর অস্ত্রসস্ত্র গোলা বারুদ এবং তাদের শিবির। আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি প্রত্যেকটা শত্রু শিবির আমরা বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি। বিধ্বস্ত করেছি আমরা তাদের সব অস্ত্র আর গোলা বারুদ। খান সেনাবাহিনী যখন বুঝতে পারলো তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন তারা বাংলার মেরুদণ্ড ভেংগে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো কারফিউ আর ব্লাক আউট দিয়ে শুরু করলো বাংলার বুদ্ধিজীবি হত্যা। ওরা ভেবেছিলো পরাজয়ের আগে বাংলাকে সম্পূর্ণ-বিকলাঙ্গ করে যাবে এবং সেই উদেশ্যেই তারা এ কাজে মেতে উঠলো। জল্লাদ ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর অধিনায়কগণের মাথা দিয়েই এ বুদ্ধি বেরিয়ে এসেছিলো সেদিন। বাংলার মানুষই সেদিন ওদের সহায়তায় এগিয়ে গিয়েছিলো—যাদের বলা হয় বদর বাহিনী আর রাজাকার! এরাই হলো বাংলার কলঙ্ক যাদের সাহায্যে চলেছিলো সেদিন বাংলার অমূল্য সম্পদ বুদ্ধিজীবি হত্যা যজ্ঞ।

রাগে ক্ষোভে বনহুরের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। অধর দংশন করে নিজকে স্বাভাবিক করে নিলো সে তারপর আবার বলতে শুরু করলো—এই সব আল-বদর আর আল-শামস ও রাজাকারগণ যদি খান সেনা বাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে না যেতো তা হলে বাংলা আজ এমন ভাবে অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়তো না। নিধন হতো না বাংলার মানুষ। এই সব বদর বাহিনী ও রাজাকাররা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে খান সেনা বাহিনীকে গ্রাম হতে গ্রামে চালিয়েছে হত্যালীলা আর অগ্নিকাণ্ড। আর চালিয়েছে বাংলার মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার। পাপ কোনদিন স্থায়ী হয় না তাই খান সেনা বাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনার মর্যাদা থাকা সত্বেও তারা পরাজয়ের গ্লানি

ললাটে মেখেছে। একটু থেমে পুনঃরায় বলতে শুরু করলো বনহুর—আজ বাংলা স্বাধীন হয়েছে কিন্তু একেবারে শত্রুমুক্ত হয়নি। বাংলার মাটিতে এখনও অনেক আলবদর আর রাজাকার সভ্য মানুষের মধ্যে ভদ্র মানুষের মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঁ এবার খুঁজে বের করতে হবে সেই সব দালাল আর দুস্কৃতি কারীদের।

সেদিনের মত বক্তব্য শেষ করে বনহুর।

সভা ভঙ্গ হয় এবার।

মুক্তি যোদ্ধা গণ এর পর হাসান ভাইকে নিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। আজ তারা স্বাধীন বাংলার মানুষ এটাই তাদের বড় খুশি।

❑

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় শামীমার। ধর্ ফর্ করে বিছানায় উঠে বসে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে। এ শব্দটা কিসের। একটু পরেই বুঝতে পারে কেউ তাদের সদর দরজায় টোকা দিচ্ছে। শব্দটা মৃদু হলেও বেশ স্পষ্ট। শামীমার এ শব্দ পরিচিত কারণ প্রায় রাতেই এ ধরণের শব্দ সে শুনে এসেছে এবং জানে সে এ শব্দ কারা করেছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক দুষ্কৃতিকারী এই বাংলার বুকেই আত্মগোপন করে আছে। তার বড় ভাই রিয়াজ আলী একজন বদর বাহিনীর লোক। হানাদারদের সময় সে খান সেনা বাহিনীকে যথাসাধ্য সাহায্য করে এসেছে। বহু গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বহু অসহায়া নারীর ইজ্জৎ বিনষ্ট হয়েছে। শামীমা এসব দেখেছে, প্রতিবাদ করেছে সে জন্য তাকে অনেক কষ্টও ভোগ করতে হয়েছে।

শামীমার বাবা ছিলেন হাজী মোহসীন আলী। তিনি ভাল লোক ছিলেন। তার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে রিয়াজ আলী আর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শামীমা আর সিমু। রিয়াজ আলীর মা মারা যাবার পর শামীমার মাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি।

শামীমা আর শিমু জন্ম হইবার পর হাজী সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী ও জান্নাতবাসী হলেন। হাজী সাহেব একেবারে ভেংগে পড়লেন। নানা চিন্তা ভাবনায় তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনিও মারা গেলেন।

রিয়াজ আলী তখন বেশ বড়। সংসার সম্বন্ধে তর তখন জ্ঞান হয়েছে। শামীমা আর শিমু ছোট। রিয়াজ আলীর মাথায় সংসার চেপে বসলো। এতে সে হাঁপিয়ে না পড়ে খুশিই হলো বেশি। কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ার মাতব্বরের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলো ঘরে। রিয়াজের বৌ এসে প্রথমেই শামীমা আর শিমুকে বিষ নজরে দেখলো।

এরপর থেকে শামীমা আর সিমুর জীবন এ সংসারে বড় দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটতে লাগলো। এতো অসহায় অবস্থার মধ্যেও শামীমা গ্রাম্য হাই স্কুল থেকে ভালভাবে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলো। ছোট ভাই সিমু এখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

বর্বর পশ্চিমা হানাদারগণ যখন বাংলার বুকে হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছিলো তখন শামীমার হৃদয় পশ্চিমা হানাদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় বিদ্বেষে ভরে উঠেছিলো আরো ঘৃণা এসেছিলো তার মনে, যখন তার বড় ভাই রিয়াজ আলী পশ্চিমা হানাদারদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিলো। তাদের গ্রামের আশে পাশের গ্রামগুলিতে তার ভাই রিয়াজ আলীর সহায়তায় যখন খান সেনা বাহিনী চালিয়েছিলো ধ্বংস যজ্ঞ। বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে ওরা, বহু নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার উপর চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার।

শামীমা প্রতিবাদ করেছিলো ভাই-এর কাছে, কিন্তু তার জন্য তাকে পেতে হয়েছে অনেক লাঞ্ছনা অনেক যাতনা। এমন কি খান সেনাবাহিনীর হাতে তাকে তুলে দেবার কথাও বলে শাসিয়ে ছিলো রিয়াজ আলী।

শামীমা সেদিন ডুকরে কেঁদেছিলো, ভাই এর মুখে এমন অশোভন কথা শুনবে ভাবতে পারেনি সে। সে তো তেমন কিছু বলেনি শুধু বলেছিলো— ভাইজান তুমি জ্ঞানী বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে কেনো দেশের এমন ক্ষতি করছো। বাংলাদেশের মানুষ তোমারই তো ভাই বোন। শামীমার কথা সেদিন শেষ হয়না ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলো রিয়াজ আলী—শামীমা মুখ সামলে কথা বলবি। লেখাপড়া শিখেছিস বলে বড় ভাইএর কাজের দোষ ধরবি এ আমি ভাবতে পারিনি।

সেদিনের পর থেকে অনেক কথাই তাকে নীরবে হজম করতে হয়েছে। অনেক কিছু চোখে দেখেও কোন প্রতিবাদ সে করতে পারেনি, শুধু দেখেই গেছে শামীমা।

তার বড় ভাই রিয়াজ আলী প্রায়ই গ্রাম থেকে সুন্দরী যুবতীদের নিয়ে আসতো, তারপর তাদের চালান করতো শহরে খান সেনাবাহিনীর শিবিরে। যুবতীদের নিয়ে যাবার সময় তার বাবা মা'র কাছে বলা হতো এই তো ক'দিন পর তোমাদের মেয়েরা চলে আসবে সঙ্গে আনবে প্রচুর টাকা পয়সা। কিন্তু হায় কেউ আর ফিরে আসেনি।

সেই সব যুবতীদের বাবা মা প্রায়ই এসেছে রিয়াজ আলীর কাছে, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেছে বৈঠকখানার সামনে। বেলা গড়িয়ে গেছে তবু তাদের সঙ্গে দেখা করার সময় হয়নি রিয়াজ আলীর হয়তো বা সেদিন ফিরে গেছে আবার এসেছে পরদিন, কই তাদের মেয়েরাতো ফিরে এলোনা।

যতই দিন গেছে আকুলভাবে মাথা ঠুকে রোদন করেছে তারা। রিয়াজ মিয়া শাসন করেছে এ ভাবে কাঁদলে খান সেনা বাহিনী তাদেরকে গুলি করবে। প্রাণের ভয়ে ফিরে গেছে তারা ললাটে করাঘাত করতে করতে।

তারপর শোনা গেছে সেই সব হতভাগীনী যুবতীদের কারো কারো রক্তাত মৃত দেহ পড়ে আছে কোন গর্তে বা পুকুরের পানিতে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়।

দু'একজন ফিরে এসেছিলো কিন্তু তাদের দিকে তাকানো যায়না এমন অবস্থা। শরীরের বহু অংশ খান সেনা বাহিনী কুকুরের মত কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। ফিরে এসে কেউ বা আত্মহত্যা করেছিলো কেউ বা উন্মাদিনীর মত বেঁচে আছে আজও। কিন্তু যারা বেঁচে আছে তারা আজ অন্তঃসত্তা অবিবাহিতা যুবতীগণ আজ তারা মা হতে চলেছে।

এসব অসহায় নারীদের কথা স্মরণ করে শামীমা ব্যাথায় মুষড়ে পড়তো কিন্তু সে কোন কথা বলতে পারতো না কারণ তারই বড় ভাই যে এই সব অশোভনীয় কাজের সহায়ক। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, খান সেনারা পরাজয়ের কালিমা মুখে লেপন করেছে। শামীমা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে, ভেবেছ এবার থেকে দেশ পাপমুক্ত হলো।

শামীমাদের বাড়িতে বেটারী রেডিও ছিলো অতি গোপনে সে শুনতো স্বাধীন বাংলার সংবাদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের বজ্রকণ্ঠের বাণী তার হৃদয়ে আলোড়ন জাগাতো। ধমনির রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছা হতো তার সেও ছুটে গিয়ে যোগ দেবে মুক্তিবাহিনী ছেলেদের সঙ্গে। বড় ভাল লাগতো তার ঐ গানগুলো, যে গান মুক্তি পাগল মানুষকে চঞ্চল করে তুলতো কিন্তু বড় সাবধানে তাকে শুনতে হতো হঠাৎ যদি বাড়ির কেউ জানতে পারে

তাহলে কোন উপায় থাকবেনা। হয়তো এজন্য শামীমাকে অনেক লাঞ্ছনা পোহাতে হবে। মিথ্যা নয় একদিন কেমন করে যেন টের পেয়ে গিয়েছিলো তার ভাবী সাহেবা, ব্যাপারটা বলে দিয়ে ছিলো সে রিয়াজ আলীর কাছে। রিয়াজ আলী কথাটা শুনে যেন বোমার মত ফেটে পড়েছিলো, তার বাড়িতে স্বাধীন বাংলার সংবাদ শোনা হয়। এতো বড় দুঃসাহস শামীমার। সেদিন থেকে টেনজিষ্টারটাও সরিয়ে ফেলেছিলো রিয়াজ আলম। শামীমা সংবাদ না শুনতে পেয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলো কিন্তু কি করবে কোন উপায় নাই তার। পাশের এক বাড়িতে একটা কমদামী টেনজিষ্টার ছিলো অতি গোপনে মাঝে মাঝে গিয়ে সে শুনে আসতো। যখন শামীমা শুনতো খান সেনা বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটছে তখন মন তার আনন্দে নেচে উঠতো। শামীমার বয়স কম হলেও সে সব বুঝতো খুশি হয়ে সে দু'হাত তুলে খোদার কাছে মোনাজাত করতো, হে দয়াময় রহমানুর রাহিম তুমি জানো তুমি সব বুঝ অন্যায় আর পাপকে তুমি ক্ষমা করোনা।

হয়তো শামীমার মোনাজাত আল্লাহ কবুল করছিলেন এবং অমনি আরও কত শত শত মানুষের করুণ মোনাজাত তিনি করেছিলেন যার জন্য অন্যায় আর পাপ স্থায়ী হলোনা। বাংলার মানুষের কাছে তার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

যেদিন পাকবাহিনীর অধিনায়কগণ আত্মসমর্পন করলো, যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, সেদিন শামীমা বড় খুশি হয়েছিল যদিও সেদিন তাদের বাড়িতে বয়ে গিয়েছিলো শোকের হাওয়া। রিয়াজ আলী একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলো সেদিন, কে যেন তার মুখে এক পোঁচ চুন কালি মাখিয়ে দিয়েছিলো।

ভাই-এর অবস্থা দেখে মনে মনে বড় খুশি হয়েছিলো শামীমা কিন্তু মুখে তাকে করুণ ভাব টেনে রাখতে হয়েছিলো। যদি রিয়াজ আলী জানতে পারে তাহলে তাকে বাড়ি হতে বের করে দেবে।

দেশ স্বাধীন হলো, শামীমা এবার বুক ভরে নিশ্বাস নিলো। যাক এবার তাহলে বাংলার মানুষ বাঁচলো। খান হানাদাররা আর তাহলে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষগুলোকে কুকুরের মত গুলি করে মারতে পারবেনা।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই শামীমা বুঝতে পারলো বাংলা স্বাধীন হলেও বাংলা অভিশাপ মুক্ত হয়নি। সোনার বাংলার শ্যামল মাটির বুকে

এখনও অসংখ্য কাল-কেউটে লুকিয়ে আছে। যারা শুধু দেশের শত্রু নয় দেশের অভিশাপ।

রিয়াজ আলীর মুখ চুন হলেও চোখের আগুন নেভেনি। প্রায় রাতেই তার কাছে কারা যেন আসে যায় গোপনে, কি সব কথাবার্তা হয়। আবার কোথায় যেন যায় তারা যাবার সময় রিয়াজ আলীও তাদের সঙ্গে যায়।

শামীমা অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছে ব্যাপারটা। যারা তার ভাই-এর কাছে আসে, তারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নয় কেমন যেন সব কথা বলে। লোকে বলে ওরা নাকি অবাঙ্গালী।

হলুদ খালির অদূরে এদের কলোনী। এখানে বহু অবাঙ্গালী বাস করে। গ্রামের এবং শহরের যারা দালাল শ্রেণীর লোক তারাও নাকি এখন মুক্তিবাহিনীর তরুণদের ভয়ে নিজ নিজ বাড়ি ঘর ছেড়ে এসব কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছে।

রিয়াজ আলী এখনও বাড়ি ছেড়ে কলোনীতে আশ্রয় না নিলেও সর্বক্ষণ কলোনীর অবাঙ্গালী আর দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। খান সেনা বাহিনীর সময় অবাঙ্গালী আর দালালরাই ছিলো সর্বে-সর্বা যথেচ্ছা চারণ করে নিতো তারা সর্বত্র। খান সেনা বাহিনীর দক্ষিণ হস্ত ছিলো এরা। বাংলা স্বাধীনতা লাভ করার পর এরা চুপছে গেছে ছেঁদা বেগুনের মত। কেটোর মত লুকিয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে। কিন্তু মনে ওদের জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন, সুযোগ পেলেই কেউটে সাপের মত ছোবল মারবে।

রিয়াজ আলীও চুপসে গেছে কিন্তু একেবারে ভেংগে পড়েনি, গোপনে সে অবাঙ্গালী আর দালালদের সঙ্গে যোগ রেখে চলেছে। কেমন করে বাঙ্গালীদের সায়েস্তা করা যায়, কেমন করে বাংলাদেশকে ধ্বংস করা যায়।

শামীমার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সে বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ায় মেঝেতে; ভাইয়ের গায়ে লেপটা ভাল ভাবে টেনে দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে দেখে সে। বাহিরটা বেশ অন্ধকার তবু শামীমা বুঝতে পারে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের গেটের দরজার কাছে। তাদেরই একজন মাঝে মাঝে দরজায় টোকা দিচ্ছে।

শামীমা রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে আজ আবার কি সংবাদ নিয়ে এসেছে ওরা।

একটু পরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে তার ভাইজান রিয়াজ আলী? তার হাতে কোন আলো না থাকলেও তবু সে অন্ধকারেই লোক দু'জনাকে চিনতে পারে বলে মনে হলো? চাপা গলায় বললো—তোমরা এসেছো?

একটা কর্কশ অথচ চাপা কণ্ঠস্বর—হাঁ রিয়াজ সাহাব।

কি সংবাদ?

সংবাদ ভাল আছে। আজ এগারো আদমী লে আয়া।

এগারোজনকে এনেছো?

হাঁ। পূর্বের কণ্ঠস্বর।

রিয়াজ আলীর গলা—এদের কোথা থেকে আনা হলো?

পাঁচ আদমী খুলনা-ছে, চার আদমী ঢাকা-ছে দো আদমী রাজশাহী-ছে আনা হয়েছে সাহাব।

এরা কি সব বুদ্ধিজীবী মহলের লোক?

হাঁ, সব আদমী বুদ্ধিজীবি আছে।

খান সেনা বাহিনী এত বুদ্ধিজীবিদের খতম করেছে আবার এদের জীবিত রেখেছিলো কেনো?

এ লোকদের কাছে কই বাত নিকলে নে লিয়ে রাখা-থা। আভি এ লোকদের খতম করনে হোগা রিয়াজ সাহাব।

তবে আর দেরী কেনো এনেছো খকম করে দাও।

আপকো যানে হোগা।

হাঁ আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। যে ভাবে ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে ঠিক ঐ ভাবে এদের হত্যা করতে হবে। প্রথমে চোখগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ হাত পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তৃতীয়তঃ ওদের হৃদপিন্ড কেটে বের করে নিতে হবে।

অন্ধকারে কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে শামীমা শিউরে উঠলো। মানুষ এতো বড় হৃদয়হীন হতে পারে। শামীমা শুনেছিলো খান হানাদারগণ এ ভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। বাংলার শত শত অমূল্য প্রাণকে তারা সমূলে ধ্বংস করেছে কিন্তু এরা তো খান বাহিনী নয়, এরা বাংলারই মানুষ অথচ তারাও এতো বড় পাষন্ড। শুধু আজই নয় এর আগেও তার ভাই এমন কত নিরীহ মানুষকে গোপনে হত্যা করেছে। বদর বাহিনীর একজন সেরা দালাল রিয়াজ আলী। খান সেনা বাহিনীদের প্রধান প্রধান সহায়কদের মধ্যে সে একজন। শামীমার মন ঘৃণায় ভরে উঠে।

শামীমার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অন্ধকারে একজন রিয়াজ আলীকে লক্ষ্য করে বলে উঠে—আপ চলিয়ে না রিয়াজ সাহাব।

হাঁ আমি যাবো তোমরা একটু অপেক্ষা করো। কথাটা বলে ভিতরে চলে যায় রিয়াজ আলী।

শামীমা আর বিলম্ব করেনা· সে ফিরে যায় নিজের বিছানার পাশে। ঘুমন্ত ভাইটার শরীরে হাত বুলিয়ে একবার দেখে নেয় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে সে। মাথা যেন ঝিম ঝিম করতে থাকে শামীমার, বলে কি এখনো এরা গোপনে হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে। শুধু হত্যাই নয় যদের বন্দী করে আনা হচ্ছে বা রাখা হয়েছে তাদের উপর চালানো হচ্ছে নির্মম পাশবিক নির্যাতন। না না আর এদের হত্যার সুযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে এই সব হতভাগ্য বুদ্ধিজীবীদের।

কিন্তু কি করে এদের বাঁচানো যায়। হঠাৎ শামীমার মাথায় একটা খেয়াল এলো। তাদের বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে হলুদখালি বলে মুক্তি বাহিনীদের একটা ঘাঁটি আছে। শামীমা হলুদখালি ঘাঁটির ক্যাপ্টেন হাসানের অনেক কথা শুনেছে? তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের হলুদখালির মুক্তি যোদ্ধাগণ বীর বিক্রমে খান হানাদারদের সঙ্গে লড়েছে। অকাতরে প্রাণ দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সার্থক করে তুলেছে। হাসানের বীরত্বের কাহিনী শুনে শামীমার মন ওর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। আজ এই মুহূর্তে শামীমার মনে পড়ে হাসানের কথা। এই সব অসহায় বুদ্ধিজীবীদের বাঁচানোর একটা বিপুল আশা উকিয়ে দেয় তার মনে। কোন রকমে হলুদখালি ঘাঁটিতে পৌছতে পারলে সে হাসানের সহায়তা কামনা করবে।

শামীমা উঠে দাঁড়ালো।

আঁচলখানা জড়িয়ে নিলো সে ভাল করে শরীরে তারপর বাড়ির পিছন দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো।

অন্ধকার রাত।

চারিদিক থেকে ভেসে আসছে ঝি-ঝি পোকার অবিশ্রান্ত আওয়াজ। হীমধারা ঠাণ্ডা বাতাস বাইছে। শামীমা একরকম প্রায় ছুটেই চলেছে হলুদখালি ঘাঁটির দিকে। হলুদখালি সে গেছে কয়েকবার তাই পথ চিনতে ভুল হয়না শামীমার। অবশ্য মুক্তিবাহিনীদের ঘাঁটি কোথায় তা সে ভাল করে জানে না তবু তার সাহস আছে হলুদখালি পৌছতে পারলে যেমন করে হোক খুঁজে নেবে। কারণ শামীমা তার ছোট ভাই শিমুর মুখে শুনেছিলো হলুদখালির দক্ষিণ পাড়ার কোন এক জায়গায়।

শামীমার মনে আজ কোন ভয় নাই। একটা অসীম মনোবল তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

শামীমা এর পূর্বে কোনদিন রাতের অন্ধকারে এমনভাবে বাড়ির বাইর হয় নাই তবু একা নিঃসঙ্গ অবস্থায়। মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে হঠাৎ যদি কেউ তার পথ আগলে দাঁড়ায়, মনে মনে শিউরে উঠে শামীমা। কিন্তু পরক্ষণেই মন থেকে সব ভয় মুছে ফেলে ছুটতে থাকে।

হলুদখালি গ্রামের নিকটে পৌছে গেছে শামীমা। কোন এক বাড়ি থেকে কুপির আলো নজরে পড়ছে। কুকুরের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। সামনে কয়েকটা জমি পেরুলেই হলুদখালি।

শামীমার শরীর ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে যেন? হাওয়ার বেগ আরও বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। শামীমা-ঐ কুপির আলো লক্ষ্য করে দ্রুত পা চালিয়ে চলেছে। আঁচলখানা আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে সে গায়ে।

হঠাৎ শামীমা চমকে উঠে—দু'জন লোক তার সম্মুখে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। অন্ধকারে লোক দুটোকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে।

শামীমা কম্পিত গলায় বলে উঠে—কে, কে তোমরা?

লোক দুটো হেসে উঠে, একজন বলে—এ্যাঁ মেয়ে লোক দেখছি......

আর একজন বলে—আমরা কে পরে বলবো। তুমি কে আগে তাই বলো আর এতো রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছো তাও বলো?

শামীমা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেও মুখে সাহস এনে বললো—আমার আত্নীয়ের বাড়ি যাচ্ছি। পথ ছেড়ে দাও।

একজন বললো—আত্নীয়। হলুদখালি কার বাড়ি যাবে বলোনা?

শামীমা তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো—তোমাদের শুনে কোন ফল হবেনা? আমাকে যেতে দাও।

দ্বিতীয়জন বললো—শুনে ফল হবেনা এ্যাঁ কি বললে ফল হবেনা? আর তুমি যেতে দাও বললে আর—আমরা যেতে দিলাম।

প্রথমজন বললো—অন্ধকারে দেখা যচ্ছে না। মেয়েটা নিশ্চয়ই কোন বাড়ির বৌ পালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় জন বললো—যাক্ ভালই হলো ওকে নিয়ে চলো ঐ ঝোপটার আড়ালে......

এতো শীতেও শামীমার শরীর থেকে ঘাম ছুটলো। হায় একি বিপদ হলো, মনে প্রাণে খোদাকে স্মরণ করতে লাগলো সে।

কিন্তু ততক্ষণে গুণ্ডা লোক দু'জন শামীমাকে ধরে ফেলছে। দু'জন টেনে নিয়ে চলে ঠিক ঐ মুহূর্তে পিছন থেকে কে যেন আক্রমণ করে ওদের দু'জনাকে। বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরে লোক দু'টোর জামার পিছন অংশ।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা শামীমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

তবু রেহাই পায়না ওরা অন্ধকারে কে যেন এক একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দেয় ওদের নাকে। নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত বেরিয়ে আসে। হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠে একজন গুণ্ডা। একজন পালাতে যাচ্ছিলো। বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরে ওর ঘাড়টা দাঁতে দাঁত পিষে আর একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় ওর দাঁতের পাটিতে ছায়ামূর্তি।

কয়েকটা দাঁত ভেংগে যায় প্রথম জনের।

দ্বিতীয় জনেরও সেই অবস্থা। দুজন প্রাণ নিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যায়।

এতক্ষণ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে এই অদ্ভুত কান্ড দেখ ছিলো শামীমা যদিও অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিলনা তবু সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো কেউ তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং গুণ্ডা লোক দুটিকে কাহিল করে দিয়েছে। হয়তো খোদার অসীম দয়ায় কোন মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে।

শামীমার শরীরটা তখনও বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপছিলো এক পাশে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লক্ষ্য করছিলো ছায়া মূর্তিটাকে।

শয়তান লোক দুটি পালিয়ে যেতেই ছায়ামূর্তি তার দিকে তাকালো, এগিয়ে এলো তার পাশে।

শামীমার কণ্ঠ তালো শুকিয়ে গেছে একেবারে। না জানি এ-লোকটার আবার কি উদ্দেশ্য আছে কে জানে। দেহের কাপড় ভালভাবে ঠিক করে নিলো সে।

ছায়ামূর্তি শামীমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কে তুমি? আর এতো রাতে এ ভাবে কোথাই বা যাচ্ছিলে।

শামীমার কানে এ কণ্ঠস্বর যেন অপূর্ব লাগলো। কোনদিন সে এ কণ্ঠস্বর শোনেনি তুব তার মনে হলো এ কণ্ঠ যেন তার কত পরিচিত। ভয় আর আতঙ্ক নিমিশে মুছে গেলো মন থেকে অন্ধকারে শামীমা ঐ মুখখানাকে ভাল করে দেখতে চাইলো কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা। আজ আকাশে চাঁদ নেই, তারাও নেই বললে চলে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু'একটা তারা পিট পিট করে জ্বলছে।

পৃথিবী যেন জমাট অন্ধকারে ভরে উঠছে। নিজের শরীরটাও ভাল করে নজরে পড়ে না।

শামীমাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে ছায়ামূর্তি বললো—

কি কথা বলছোনা যে?

এবার শামীমা বললো—জানিনা আপনি কে তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি মন্দ লোক নন। আমার পরিচয় পরে বলব কারণ আমি কোন গণ্য মান্য ব্যক্তির মেয়ে বা বোন নই। আমার তেমন কোন পরিচয় নেই যা বললে আপনি চিনতে পারবেন। তবে আমার নাম বলছি, আমার নাম শামীমা।

ছায়ামূর্তি নিশ্চুপ শুনছিলো ওর কথাগুলো।

শামীমা বললো আবার আপনি যে হন আমাকে দয়া করে হলুদখালি ঘাঁটিতে পৌছে দিন।

এবার ছায়া মূর্তি কথা বললো—হলুদখালি ঘাঁটি!

হাঁ সেখানে আমার যেতে হবে।

কেনো?

আমি সে কথা বলবো না।

জানো সেখানে বহু মুক্তি বাহিনী ছেলেরা আছে।

আমি জানি, আরো জানি তারা আমার কোন অনিষ্ট করবেনা।

আমাকে দয়া করে নিয়ে চলুন?

বলতে হবে কেনো তুমি সেখানে যেতে চাও এবং এতোরাতে। নিশ্চয় তুমি কোন......

না আমি কোন মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে সেখানে যাচ্ছিনা। ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার আছে।

ছায়ামূর্তি বললো—ক্যাপ্টেন হাসানকে তুমি চেনো?

হাঁ তাকে চিনি?

সে তোমাকে চেনে?

না।

তবে তুমি তাকে চিনলে কি করে?

পরে বলবো এখন আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। কারণ তাড়াতাড়ি তার কাছে আমার পৌছানো দরকার।

যদি বলি আমি সেই হাসান।

শামীমার নিশ্চুপ, বিস্ময়ে কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে যায়।

হেসে বলে ছায়ামূর্তি বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

শামীমার মনে তখন একটা বিপুল আলোড়ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে আপনার কণ্ঠস্বর আপনার ব্যবহার আপনাকে প্রমাণ করছে আপনিই ক্যাপ্টেন হাসান।

তবে বলো কি প্রয়োজন তোমার তার কাছে? বলো কোন দ্বিধা করো না?

শামীমা সব খুলে বলে যা সে শুনেছিলো তার শয়ন কক্ষের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে। তার বড় ভাই রিয়াজ আলী আল বদর বাহিনীর লোক এবং সে খানবাহিনীকে সব সময়ে সহায়তা করে এসে ছিলো। খান বাহিনী তার সাহায্যে বহু বাঙ্গালী হত্যা করেছে বহু নারীর ইজ্জৎ লুটে নিয়েছে। তবু সে ক্ষান্ত হয়নি, খান বাহিনীর পরাজয় বরণ করলেও রিয়াজ আলী গোপনে দুষ্কর্ম চালিয়ে চলেছে। এখন কোন গোপন স্থানে চলেছে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিদের উপর তাদের অকথ্য নির্যাতন।

হাসান শামীমার মুখে সব শোনে তার চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলে উঠে। তারপর বলে চলো শামীমা তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। তারপর যাবো সেখানে যেখানে তোমার পিশাচ ভাই...থাক চলো এবার।

শামীমা নীরবে হাসানের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

বড় ইচ্ছা হলো একবার সে হাসানকে ভালকরে দেখে নেয় না জানি ও মুখ খানা কেমন কত সুন্দর দেখতে। যার কণ্ঠস্বর এতো মধুর যার আচরণ এতো মহৎ না জানি তার চেহারা কত অপূর্ব।

❑

পাগুলি রশি দিয়ে বেঁধে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত করে তুলেছে ওরা তাদের। গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এক একটা চাবুকের আঘাতে আর্তনাদ করছে— বুদ্ধিজীবী বেচারী এগারোজন।

অদূরে একটা চেয়ারে বসে আছে রিয়াজ আলী। পাশে আরও দু'টো চেয়ারে দু'জন আল বদর বাহিনীর কমাণ্ডার বসে আছে। এরা মুক্তিবাহিনীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করে এখনও

বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সংখ্যায় বেশ কয়েকজন এখানে আছে, এদের দলে কয়েকজন অবাঙ্গালীও আছে।

এরা সবাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপনকারী আল বদর আর রাজাকার দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গোপনে বাংলাদেশের সর্বনাশ করে চলেছে। খান হানাদার বাহিনীর সময় যে সব বাংগালী সামরিক বা বেসামরিক অফিসারদের আটক করেছিলো এবং খান সেনা বাহিনীর পরাজয় মুহূর্তে বাংলার অমূল্য সম্পদ যে সব বুদ্ধিজীবীদের বন্দী করা হয়েছিলো, তাদের হত্যা করার পর যাদেরকে কোন কোন গোপন স্থানে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছিলো তাদের সরিয়ে এনে এখানে নতুনভাবে তাদের উপর অত্যাচার চলতো তারপর হত্যা করতো ওরা নৃশংসভাবে।

আজ যাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে এরা সবাই বুদ্ধিজীবী মহলের লোক। কেউ লেখক, কেউ সংবাদিক, কেউ লাইব্রেরীয়ান, কেউ শিল্পী কেউ ফটোগ্রাফার। এরা খান হানাদারদের পাশবিক অত্যচার সহ্য করেও বেঁচে ছিলো বা আছে। আজ এদের কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হবে।

চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে ওদের দেহ। রক্ত ঝরছে দর দর করে। লোকগুলো যাতে আর্তনাদ করতে না পারে সে জন্য মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। সে কি করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীগণ নানারকম অসভ্য অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে চলেছে তার সঙ্গে চলেছে নির্যাতন।

বুদ্ধিজীবীগণ আর্তনাদ করতে না পারলেও একটা গোগো শব্দ বের হচ্ছিলো তদের নাক মুখ দিয়ে, তার সঙ্গে বের হয়ে আসছিলো রক্ত। নির্দয় পাষণ্ড দল তারই উপর চালাচ্ছিলো আঘাতের পর আঘাত।

এবার রিয়াজ আলীর আদেশে বন্দীদের নামিয়ে নেওয়া হলো। দু'জন জোয়ান লোক দু'খানা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা হাতে এগিয়ে এলো।

বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা একেবারে কাহিল। ওদের মুখের মধ্য থেকে রুমাল টেনে বের করে নেওয়া হলো। কারো কারো মুখে লাগামের মত করে রশি দিয়ে এঁটে বাঁধা হয়েছিলো এবার খুলে নেওয়া হলো ওদের মুখের রশি খণ্ড।

একজন গোঙ্গানীর স্বরে বললো—একুট পানি! একটু পানি দাও......

রিয়াজ আলী বললো পানি খাবে? সবুর করো পানি এনে দিচ্ছে। তারপর নিজেদের একজনকে বললো—যাও প্রস্রাব করে নিয়ে এসো, তাই খেতে দাও।

সত্যি সত্যি লোকটা চলে গেলো একটু পরে একটা মাটির বাসনে প্রস্রাব এনে বাড়িয়ে ধরলো—নাও পানি খাবে বলেছিলে খাও।

বন্দী লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিলো, অতি কষ্টে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা চাট্লো একবার।

রিয়াজ আলী বললো—ওর মুখে ছড়িয়ে দাও।

রিয়াজ আলীর কথায় শয়তান তাই করলো, প্রস্রাবগুলো ছড়িয়ে দিলো অসহায় বন্দীটির চোখে মুখে।

হয়তো এই মুহূর্তে খোদার আরশটাও দুলে উঠলো। নিষ্পাপ বন্দীদের উপর এই অমানুষিক আচরণ তিনিও সহ্য করতে পারছেন না।

রিয়াজ আলী এবার হুকুম দিলো ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে এদেরকেও ঠিক ঐ ভাবে হত্যা করতে হবে।

আর একজন বলে উঠলো—ঠিক বলেছেন রিয়াজ সাহেব না হলে সেই সব বুদ্ধিজীবীদের আত্মা রাগ করবে।

হাঁ প্রথমে এদের চোখ তুলে ফেলে চোখে লবন লাগিয়ে দাও। বললো রিয়াজ আলী।

আর একজন বললো—তারপর হাতের আংগুলগুলো কেটে ফেলো।

তারপর পা দু'টো কাটো। পরে হাত দু'খানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলো। এই কথাগুলো বললো অপর একজন।

রিয়াজ আলী বললো—হাঁ ঠিক্ ঐভাবে কাটবে! আজ জীবনে মারবে না, সমস্ত রাত লবন পানি ক্ষত স্থানে দেবে তারপর কাল এদের বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করে নেবে।

অসহায় বন্দী বুদ্ধিজীবীরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, তাদের কানে কথাগুলো প্রবেশ করছিলো কিনা বোঝা যাচ্ছিলো না। মেঝেতে লম্বা করে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো।

যে লোকটা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা নিয়ে হুকুমের প্রতিক্ষা করছিলো সে এবার এগিয়ে যায়, প্রথমে সাহিত্যিক ফরিদ হোসেনের চোখ তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় রিয়াজ আলীর পিছনে, হাতে তার রিভলভার। বজ্র কঠিন কণ্ঠে বলে—খবরদার এক পা নড়বে না কেউ।

ফিরে তাকায় রিয়াজ আলী, সঙ্গে সঙ্গে বীবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। অন্যান্য যে কয়জন লোক ছিলো তারা সবাই ভয় বিহ্বল চোখে তাকাতে লাগলো এ ওর মুখের দিকে।

ছায়ামূর্তির হাতে উদ্যত রিভলভার, ঠিক দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে যমদূতের মত। যে লোক দু'জন সূতীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র হাতে বুদ্ধিজীবীদের চোখ তুলতে যাচ্ছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে ভীত ভাবে তাকিয়ে থকে দরজায় দাঁড়ানো জমকালো পোশাক পরা যমদূতের মত ছায়ামূর্তির দিকে।

কক্ষ মধ্যে কারো হাতেই কোন আগ্নেয় অস্ত্র ছিলো না শুধু একটা ছোরা ছিল টেবিলে আর একটা চাবুক। যে চাবুক দিয়ে এতোক্ষণ বন্দীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো। ছোরা খানা দিয়ে বন্দীদের বুক চিরে হৃদপিন্ড বের করে নেওয়া হবে সব শেষে।

ছায়ামূর্তি কক্ষ মধ্যে সকলের উপর দৃষ্টি বৃলিয়ে নিলো। মেঝেতে পড়ে থাকা বন্দীদের দিকে তাকিয়েও দেখলো সে। হয়তো বা ব্যথায় বুকটা তার মোচড় দিয়ে উঠলো। তাকালো এবার সে রিয়াজ আলীর দিকে, আলী সাহেব আপনি দোস্তদের নিয়ে এখানে আত্মগোপন করে খুব সুন্দর কাজ করেছেন দেখে খুশি হলাম।

এক অজ্ঞাত মানুষের মুখে নিজের নামের শেষ অংশ শুনে রিয়াজ আলী আশ্চর্য হলো। কোন কথা সে বলতে পারলোনা।

ছায়ামূর্তি বললেন আপনার সুকর্মের পুরস্কার দিতে এলাম। শুধু আপনাকেই নয় আপনার সঙ্গী দালালদেরকেও দেবো। এবার চেয়ার ত্যাগ করে উঠে পড়ুন আলী সাহেব। উঠুন...

রিয়াজ আলী এতোক্ষণ হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গী দু'জন যারা বসে ছিলো তারাও উঠে পড়ে।

কক্ষ মধ্যে আরও কয়েকজন ছিলো সবাই ভয় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে, এমন একটা বিপদের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা।

ছায়ামূর্তি যে কে তারা জানেনা, তার চেয়ে ছায়ামূর্তির হাতের অস্ত্র খানই তাদের বেশি আতঙ্কের বিষয়!

ছায়ামূর্তি এবার বললো—ভয় নেই, কাউকেই আমি হত্যা করবো না। হত্যা করলে তোমাদের কর্মের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে না। আলী

সাহেব আপনি নিজ হাতে বন্দীদের হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিন। যান এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

রিয়াজ আলী ও তার দলবল দালালরা সবাই কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

ছায়ামূর্তি কঠিন কণ্ঠে বললো দিন ওদের বাঁধন খুলে দিন।

এবার রিয়াজ আলী বললো—তুমি কে?

ছায়ামূর্তি হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ আমি কে জানতে চাও। তবে শোন দালাল রিয়াজ, আমি একজন মুক্তি যোদ্ধা, কি অমন শিউরে উঠলে কেনো। বিচ্ছুর বাচ্চাদের দেখে ভয় করতো যারা, তারা খান সেনার দল। তোমরা বাংলাদেশের মানুষ বাঙ্গালী, তোমরা কোনো মুক্তি বাহিনীর নাম শুনে ভয় পাচ্ছো? জবাব দাও ভয় পাবার কারণ কি?

রিয়াজ আলী কোন জবাব দিলোনা। সে এই শীতের রাতে ঘেমে নেয়ে উঠেছে একেবারে। তার সঙ্গী সাথীদের অবস্থাও কাহিল। তারাও রীতি মত ঘামছে।

ছায়ামূর্তির ধমক খেয়ে রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীরা বুদ্ধিজীবী বন্দীদের বন্ধন উন্মোচন করে দিলো।

বুদ্ধিজীবী বন্দীগণ সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কেমন যেন হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ভেবে পান না কি ঘটেছে বা ঘটতে চলছে। কে এই অজ্ঞাত ব্যাক্তি যার দয়ায় আজ এই মুহূর্তে তাঁরা মৃত্যু থেকে রেহাই পেলো। দীর্ঘ নয় মাস তাঁরা বন্দী ছিলেন, তাঁদের উপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন বাঁচার আশা তাদের ছিলো না কোন সময়। আজ ছিলো তাঁদের মৃত্যুর তারিখ। বুদ্ধিজীবী বন্দীগণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগলেন জমকালো পোশাক পরা ছায়ামূর্তিটির দিকে। ছায়ামূর্তির মুখমণ্ডলের অর্ধেক অংশ কালো রুমালে ঢাকা থাকায় তার মুখখানা দেখা যাচ্ছিলো না শুধু চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে কক্ষের সল্প আলোতে।

বুদ্ধিজীবী বন্দীদের মুক্ত করে তাদের এক পাশে যত্ন সহকারে বসিয়ে দিলো ছায়ামূর্তি। তার পর রিয়াজ আলীর দুজন সঙ্গীকে আদেশ দিলো রিয়াজ আলী ও তার দলবলকে মজবুত করে বেঁধে ফেলতে। ছায়ামূর্তির হাতে রয়েছে উদ্যত রিভলভার। কাজেই তার কথা অমান্য করে এমন সাহস কারো ছিলনা। রিয়াজ আলীর সঙ্গী দু'জন যাদের হাতের সূতীক্ষ্ণ ছোরা

ছিলো। তাদের উপরই ছায়ামূর্তি আদেশ দিয়েছিলো। রিয়াজ আলী আরও দুজন বাঙ্গালী দালাল এবং দুজন অবাঙ্গালী দালাল মোট পাঁচজন দালালকে বেঁধে ফেললো ওদের সঙ্গী দু'জন।

বুদ্ধিজীবীদের বন্ধন মুক্ত করায় প্রচুর দড়ি ছিলো সেখানে। কাজেই কোন অসুবিধা হলোনা।

ওদের মজবুত করে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোক দু'টো। তাদের চোখে মুখেও ভীত আতঙ্ক ভাব ফুটে উঠেছে। না জানি তাদের ভাগ্যে কি ঘটে কে জানে।

রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীদের মুখ মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কারো মুখে কোন কথা নাই। ওরা বুঝতে পেরেছে এবার তাদের পালা।

ছায়ামূর্তি এবার লোক দুটির উপর হুকুম করে—তোমরা একটু পূর্বে যেমনভাবে বন্দীদের চোখ তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো ঠিক তেমনি করে এদের চোখগুলি তুলে নাও।

ছায়ামূর্তির কথা শুনে আঁতকে উঠলো রিয়াজ আলী ও তার সঙ্গীরা। কাঁপতে শুরু করেছে ওরা।

ছায়ামূর্তি কঠিন কণ্ঠে বলে—কাজ শুরু করো। যাও বলছি।

অগত্যা লোক দুটো এগিয়ে গেলো। প্রথম রিয়াজ আলীর চোখ উপড়ে নেওয়া হলো। ছায়ামূর্তির নির্দেশে মুখে রুমাল গুঁজে দেওয়া হয়েছিলো।

রিয়াজ আলী ও তার চারজন সঙ্গীর চোখ তুলে ফেলা হলো। তারপর হাতের আংগুল পরে পা কেটে ফেলা হলো দেহ থেকে। নাক কানও বিচ্ছিন্ন করে ফেললো ওরা ছায়ামূর্তির নির্দেশে।

ছায়ামূর্তি এবার অট্টহাসি হেসে বললো—দেখুন রিয়াজ আলী আপনারা যখন খান সেনাবাহিনীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত শত বুদ্ধিজীবীদের উপর নির্মম অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে চলেছিলেন তখন তাদের অবস্থা কেমন হয়েছিলো এবার তা একটু উপলব্ধি করুন। হাঁ জীবনে আপনাদের হত্যা করবোনা কারণ হত্যা করলেই তো শেষ, কজেই বেঁচে থেকে উপভোগ করুন বাংলার শত শত মানুষ আপনাদের নির্যাতনে কি ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এর পর সেই দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে ছায়ামূর্তি—তোমরা আমার নির্দেশমত কাজ করলে—এ জন্য তোমাদের আমি বেশি কষ্ট দেবো না। তোমরা ঐ দেয়ালের পাশে গিয়ে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

লোক দুটো বুঝতে পারলো এবার তাদের পালা। তারা ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো, ছুটে এসে একজন পা জড়িয়ে ধরলো।

সরে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—তোমাদের মুক্তি দেবার জন্যই আমি ব্যবস্থা করছি। যে কাজ তোমরা এতোদিন করেছো তার শাস্তি আমি দেবোনা। যাও ওদিকে মুখ করে দাঁড়াও।

বাধ্য হলো ওরা।

ছায়ামূর্তি রিভলভার তুলে ধরলো সঙ্গে সঙ্গে দুটো শব্দ হলো। লোক দুটির রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়লো। ছায়ামূর্তি এবার রিয়াজ আলীর পাশে এসে দাঁড়ালো। একটানে ওর মুখের রুমাল বের করে নিতেই গোঙ্গানীর মত করে কেঁদে উঠলো।

ছায়ামূর্তি বললো—আলী সাহেব এবার বলুন—আপনাদের আর-আর বন্ধু লোক কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে?

আঃ আঃ উঃ কি অসহ্য জ্বালা......রিয়াজ আলী তখন একটানা আর্তনাদ করে চলেছে।

ছায়ামূর্তি রিভলভার দিয়ে রিয়াজ আলীর বুকে গুতো দিয়ে বলে—কেমন উপভোগ করছেন? দেখুন এবার বুঝুন আপনাদের হাতে কত লোক এমনি কষ্ট পেয়েছে। আজই তো কতকগুলো নিষ্পাপ ব্যক্তির উপর আপনারা এমনি নির্যাতন চালাতেন। সে কথা স্মরণ করুন মনপ্রাণে। হাঁ জবাব দিন আপনাদের লোক কোথায় আছে বলুন?

বলবো—বলবো আমাকে গুলি করে হত্যা করো তাহলে বলবো। এতো কষ্ট সহ্য করতে পারছিনা......

বলুন তারপর যা হয় করবো।

বলছি—বলছি মরবোই যখন তখন সব বলবো যদি এতে পাপ কিছু লাঘব হয়।

হাঁ বলুন?

রিয়াজ আলীর দেহটা তখন মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলো। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে তার জামা কাপড় ও মেঝেটা। রিয়াজ আলীর সঙ্গী সাথীদের অবস্থাও তাই। মাংস পিণ্ডের মত এক একজন ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিলো।

রিয়াজ আলী বলে—হাতীমারী বলে একটা জায়গা আছে সেখানে এখনও অনেক খান সেনা লুকিয়ে আছে। সেখানে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে।

আর বাঙ্গালী দালাল বন্ধুরা সেখানে নেই? বললো ছায়ামূর্তি।

আছে। আছে তিনজন নামকরা লোক সেখনে যারা খান সেনাদের সাহায্য করেছে। তাদের সহায়তায় বহু মানুষ নিহত হয়েছে। বহু মেয়ে মানুষকে তারা ধরে নিয়ে খান বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে।

হাঁ তারপর?

হাতি মারীতেই একটা গুদামে এখনও অনেকগুলি মেয়ে মানুষ বন্দী আছে। তাদেরকে ওরা মেরে ফেলবে বলেছে। কারণ ওদের ছেড়ে দিলে সবাইরে গিয়ে সব কথা ফাঁস করে দেবে তাই—তাই ওদের মুক্তি দেওয়া হবে না।

ছায়ামূর্তি বললো—হাতিমারী কোন যায়গায় সেই আস্তানা রয়েছে—যেখানে এখনও খান সেনাবাহিনী আত্মগোপন করে আছে?

হাতিমারীতে বহু অবাঙ্গালী আছে ঐ অবাঙ্গালীদের কলোনীতেই আছে তারা। আমি আর বলতে পারছিনা......আঃ মরলাম—মা বাবা বাবা মরলাম......

ছায়ামূর্তি আর বিলম্ব করেনা, সে বুদ্ধিজীবীদের পাশে এসে দাঁড়ায় বলে,—আপনারা হাঁটতে পারবেন কি?

বুদ্ধিজীবীরা এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছায়ামূর্তির কার্য কলাপ লক্ষ্য করছিলো। তারা নিজেদের কষ্ট ব্যথা ভুলে গিয়েছিলো। ছায়ামূর্তিকে তারা জানেনা তবে এটুকু তারা বুঝতে পারলেন সে যেই হোক বাংলাদেশের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।

বুদ্ধিজীবীরা বললেন—পারবো।

কষ্ট হবে আপনাদের তবু যেতে হবে। এখান থেকে দেড় মাইল দূরে হলুদখালি হসপিটাল আপনাদের সেখানেই নিয়ে যাবো।

ছায়ামূর্তি বুদ্ধিজীবীদের এক একজনকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো তবে একজনের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিলো তাকে ছায়ামূর্তি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বললো—এবার আপনারা চলুন।

ছায়ামূর্তির সঙ্গে মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো বন্দী বুদ্ধিজীবী কয়েকজন। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলেন তারা। দীর্ঘ নয় মাস হলো বাইরের আলো বাতাসের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলোনা।

আজ তারা মুক্ত স্বাধীন কথাটা ভাবতেই সব দুঃখ ভুলে যায়, হাঁটতে থাকে তাঁরা ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে। যদিও হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো তবু তারা প্রাণপণে এগিয়ে চলেছে।

বনহুর হাই তুলে শয্যায় উঠে বসতেই এগিয়ে এলো হীরা রোস্তম, মাহবুব আরও কয়েকজন। সবাই ঘিরে দাঁড়লো বনহুরকে।

হীরা ব্যস্তকণ্ঠে বললো—হাসান ভাই একটা সংবাদ।

সংবাদ! কি সংবাদ হীরা? তোমাদের দেখে খুব উত্তেজিত এবং আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে।

হীরা বললো—হাসান ভাই হলুদখালির পূর্ব পাড়ায় একটা গোপন বাড়িতে কতকগুলো লোককে ভীষণ এক অবস্থায় পাওয়া গেছে।

অবাক হয়ে বললো বনহুর—ভীষণ অবস্থা মানে?

হীরা পর্বের ন্যায় ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—একটা বাড়ির মধ্যে কয়েকজন লোককে হাত পা কান নাক কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

তা এমন আর কি ব্যাপার? স্বাভাবিক গলায় বললো বনহুর?

হীরা বললো—এমন অবস্থায় এতগুলো লোক আর তুমি বলছো তা এমন আর কি ব্যাপার?

তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা খুব বেশি খুশি হয়েছো খুশির কি আছে।

হীরা বললো—জানোনা হাসান ভাই এরা খান সেনা বাহিনীর একনম্বর সাহায্যকারী দালাল ছিলো। না জানি কারা এদের কাজের উচিৎ পুরস্কার দিয়েছে।

বনহুর বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—আচ্ছা একেবারে এদের হাত পা নাক কান কেটে ফেলা হয়েছে?

বলে উঠলো মাহবুব—শুধু হাত পা নাক কান নয় ওদের চোখগুলোও উপড়ে ফেলা হয়েছে।

বলো কি?

হাঁ হাসান ভাই।

তবু বেঁচে আছে ওরা?

আছে কিন্তু এখনও রক্তপাত বন্ধ হয়নি হয়তো মরবে।

বনহুর আপন মনে বলে উঠলো—বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালী হত্যা যজ্ঞে এরা খান সেনা বাহিনীকে সহায়তা করেছিলো, সত্যি দুঃখ হয় এরা মানুষ না পশু।

হামিদ বললো—জান হাসান ভাই ওরা বললো, কে নাকি একজন জমকালো পোশাক পরা লোক তাদের এ অবস্থা করেছে। দু'জনকে গুলি করে হত্যাও করেছে সেই অজ্ঞাত ব্যাক্তি।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ।

এমন সময় মহসীন ব্যস্ত হয়ে সেখানে প্রবেশ করলো।

একজন মহসীনকে লক্ষ্য করে বললো—ব্যাপার কি অমন করে হাঁপাচ্ছিস কেনো।

একটা ঘটনা......

তোর আগে আমরা দেখে এসেছি। হাত পা কান নাক কাটা লোকগুলো কথা তো? কথাগুলো বললো রোস্তম।

মহসীন বললো—হাত পা কান নাক কাটা এসব কি বলছিস রোস্তম?

হাঁ সত্যি সত্যি বলছি। তুই তবে কি ঘটনা শোনাবী? নতুন কিছু বুঝি?

আমি হসপিটাল থেকে আসছি। বললো মহসীন।

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—কি ব্যাপার হসপিটালে আবার কি ঘটলো?

মহসীন বললো—হাসান ভাই আজ রাতে হসপিটালে এগারো জন আহত বন্দী বুদ্ধিজীবীকে কে বা কারা রেখে গেছে।

সবাই অবাক হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় মহসীনকে। তার মুখে ঘটনা শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলো যেন। মহসীন বললো চলুন হাসান ভাই দেখবেন চলুন।

হীরা বললো—হাঁ চলো হাসান ভাই কোথা থেকে এ বুদ্ধিজীবীরা হলুদখালি হসপিটালে এসেছেন এবং কে তাঁদের রেখে গেছেন জানা দরকার।

বনহুর উঠে দাঁড়লো—তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমি আসি, মুখ হাত ধুয়ে আসি।

মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা সবাই হলুদ খালি হসপিটালে যাবার তৈরি হয়ে নেয়।

অল্পক্ষণে ফিরে আসে বনহুর।

সবাই মিলে রওয়ানা দেয় হলুদখালি হসপিটাল অভিমুখে।

হসপিটালে পৌছে বনহুর ছেলেদের নিয়ে সর্বপ্রথম অসুস্থ বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে দেখা করে। বুদ্ধিজীবিরা তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করে শোনায়।

সব শুনে বনহুরের সঙ্গীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। যে সব দালালদের হাত পা নাক কান কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে তারাই বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা সেই রকম করবে বলে প্রস্তুতি নিয়েছিলো কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি।

হঠাৎ এক বলিষ্ঠ পুরুষ সেখানে আবির্ভূত হয়ে দালালদের দ্বারাতেই অন্যান্য দালালদের অবস্থা তাদের পরিকল্পনা মত করেছে।

সব যেন আশ্চর্য লাগে, অদ্ভুত মনে হয়। সবাই ভাবে কে সে মহাপুরুষ যে রাতের অন্ধকারে আবির্ভূত হয়ে পরোপকার করে বেড়ায়। তার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয় সবার মাথা।

হলুদখালি ঘাটির মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা সবাই শিক্ষিত। উচ্চ শিক্ষিত ছেলেও আছে তাদের মধ্যে। হামিদ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এম, এস, সি পাশ করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিলো সেই হামিদ এ কথা শুনে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—হাসান ভাই জানি না কে সেই বন্ধু যার অসীম দয়ায় এতোগুলো মূল্যবান জীবন আজ রক্ষা পেয়েছে।

মাসুদ বলে উঠলো—তাকে যদি একবার পেতাম তাহলে......

তাহলে কি করতে মাসুদ? বললো বনহুর।

অন্তর দিয়ে তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাতাম।

একটু হাসলো বনহুর তারপর বললো—তোমাদের ভালবাসা শ্রদ্ধা সে যেখানেই থাকুক গ্রহণ করেছে ভাই। তোমাদের ভালবাসাই যে তার একমাত্র কাম্য।

বনহুরের কথাটা তখন গভীরভাবে কারো ভেবে দেখার সময় ছিলো না। হসপিটালের বড় ডাক্তার এলেন ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে। বুদ্ধিজীবিদের অসুস্থতা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে।

হসপিটাল থেকে ঘাঁটিতে ফিরতে বেলা হয়ে গেলো অনেক।

❑

রিয়াজ আলীর বাড়ি।

সমস্ত বাড়ি কান্নার করুণ বিলাপে ভরে উঠেছে। রিয়াজ আলীকে একটা ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সব। এখনও রক্ত বন্ধ হয়নি, ডাক্তার ডাকা হয়েছিলো কিন্তু ডাক্তার আসতে রাজি হয়নি! শেষে এক হাতুরে ডাক্তার এসে কিছু ঔষধ পত্র দিয়েছে তাতে কিছু ফল হয়নি রক্তও বন্ধ হলো না।

শামীমা ভাইয়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে। যদিও সে নিজেই এর জন্য দায়ী কিন্তু এক ছাড়া তার কোন উপায় ছিলোনা। কত লোক রিয়াজ আলীর চক্রান্তে আত্মহুতি দিয়েছে তার কোন

হিসেব নেই। শামীমা চেয়েছিলো তার ভাই ও তার দল বলকে সায়েস্তা করে অসহায় বুদ্ধিজীবীদের রক্ষা করবে হাসান। ভাবেনি যে রিয়াজ আলীর এ অবস্থা হবে।

শামীমা সব জেনেও কিছু বলতে পারে না বা বলেনা। শুধু রাগ হয় তার হাসানের উপর। এতো নির্দয় সে। দু'দিন পর রিয়াজ আলী মারা গেলো। তার সহকর্মীদের সবাই তখন মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণছে। এতো রক্ত ক্ষয়ের পর কেউ কি বাঁচতে পারে।

যে রাতে রিয়াজ আলী মৃত্যু বরণ করলো সেই রাতে শামীমা বেরিয়ে পড়লো ক্যাপ্টেন হাসানের উদ্যেশে। থম থমে রাত, আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন মাঝে মাঝে বিদুৎ চমকাচ্ছে।

শামীমা দ্রুত এগুচ্ছে যেমন করে হোক আজ সে ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সে কি বলছিলো তার ভাইকে এ ভাবে হত্যা করুক। হাসান কেনো এ ভাবে তার ভাই এর হাত পা নাক কান কেটে তাকে কষ্ট দিলো জিজ্ঞাসা করবে সে তার কাছে......

হঠাৎ একটা বাজ পড়লো অদূরে কোথাও। শামীমার চিন্তা জাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ভয় পেয়ে গেলো সে ভীষণ ভাবে। ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকটা ছেলে সেই পথে যাচ্ছিলো বিদ্যুতের আলোতে তারা শামীমাকে দেখে আশ্চর্য হলো এতো রাতে এ পথে মেয়ে লোক কোথায় যাচ্ছে। নিশ্চই কোন বিপদে পড়েছে বোধ হয়।

ছেলের দল শামীমার কাছে এসে বললো আপনি কে? কোথায় যাবেন?

শামীমা বললো—আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমাকে হলুদখালী ঘাটিতে নিয়ে যাবেন একটু?

ছেলেরা হলুদখালি ঘাটিতেই যাচ্ছিলো একজন বললো—আমরা সেখানেই যাচ্ছি। আপনি সেখানে কেনো যাবেন জানতে পারি কি?

শামীমা বললো আমি ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে যাবো আর একজন বললো—বেশ চলুন।

শামীমা তরুণদের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

তরুণ মুক্তিযোদ্ধাগণ কিছুটা অবাক না হয়ে পারেনা। তারা ভাবে এ মেয়েটির সঙ্গে তাদের হাসান ভাই এর কি সম্পর্ক আছে। মনে মনে ভাবলেও কেউ মুখে কিছু প্রকাশ করেনা।

হলুদখালি ঘাটিতে পৌছেই দু'জন ছেলে ছুটে গেলো ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে।

হাসান তখন একটা বই পড়ছিলো, চোখ না তুলেই বললো—তোমাদের ফিরতে এতো রাত হলো কেনো?

একজন বললো—পথে হঠাৎ একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

মেয়ে? অবাক হয়ে তাকালো হাসান ছেলেটির মুখে।

হাঁ একটি মেয়ে। দেখো হাসান ভাই আমরা শিবপুর থেকে আসছি হঠাৎ পথে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। মেয়েটা বিপদে পড়েছে মনে করে আমরা এগিয়ে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করায় বললো, সে হলুদখালি ঘাটিতে যেতে চায় এবং ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। জানিনা কে সে কিই বা তার পরিচয় আর কেনই বা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললো সেলিম।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো হাসানের, বই রেখে সোজা হয়ে বসে বললো—কোথায় সে মেয়েটি?

পাশের কামড়ায় বসিয়েছি! তুমি চলো হাসান ভাই। বললো খালেক।

হাসান বললো—আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি কিন্তু তোমরা আমার পরিচয় দেবে না তার কাছে। তোমরা বলবে আমার নাম ফরিদ খান।

হাসানের কথা মত শামীমার কাছে কেউ তার পরিচয় বললো না। সবার সঙ্গে হাসান যখন এসে দাঁড়ালো শামীমার সামনে তখন শামীমা বিস্ময় নিয়ে তাকালো তার দিকে।

মাসুদ বললো—হাসান ভাই ঘাঁটিতে নাই, আপনি ফরিদ ভাই এর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

মুহূর্তে শামীমার মুখ মণ্ডল নিস্প্রভ হলো সে ভেবেছিলো তার সম্মুখে যে এসে দাড়ালো সেই বুঝি ক্যাপ্টেন হাসান অবশ্য সেই রাতে শামীমা ক্যাপ্টেন হাসানকে দেখেছিলো কিন্তু তাকে স্পষ্ট করে দেখেনি সেদিন রাতের অন্ধকারে। তাই হাসান কে শামীমা আজ আলোর সামনে চিনতে পারে না।

মাসুদের কথায় বলে শামীমা—আমার দরকার ক্যাপ্টেন হাসান কে ফরিদ ভাইকে নয়।

হাসান মাথা চুলকে বলে দুঃখিত আজ সে ফিরবে কি না ঠিক নেই। আপনি কি আজ আমাদের ঘাঁটিতে অপেক্ষা করতে চান?

শামীমা সহসা কোন জবাব দিতে পারেনা। আজ সে কতটা পথ অনেক কষ্ট করে এসেছে। ক্যাপ্টেন হাসানের সঙ্গে দেখা করা তার একান্ত আবশ্যক। সে চায়নি তার ভাইকে ওভাবে শাস্তি দিয়ে সায়েস্তা করুক। একটা অভিমান দানা বেঁধে উঠেছে তার মনে। বলে শামীমা—না।

তবে আপনি বলে যেতে পারেন ক্যাপ্টেন হাসানকে কিছু বলবার থাকলে? বললো হাসান।

না, তাকেই বলবো।

তবে আমরা কি করতে পারি? আপনি তাহলে যেতে পারেন আমাদের ছেলেরা আপনাকে পৌঁছে দেবে।

না, লাগবেনা। আমি একাই যেতে পারবো। শামীমা চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

হাসান বলে—হারুন, খালেদ তোমরা দু'জন যাও ওকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে এসো।

শামীমা একবার ক্যাপ্টেন হাসানের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।

শামীমা বেরিয়ে যায় তার সঙ্গে যায় হারুন আর খালেদ।

আকাশ তখন মেঘ শূন্য হয়ে এসেছে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই মাসুদ বললো—হাসান ভাই আমরা মনে করেছিলাম মেয়েটির সংগে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটি তোমায় দেখেও চিনতে পারলোনা।

বনহুর একটু হাসলো সে বুঝতে পেরেছিলো, ছেলেরা ঐ রকম কিছু ভেবেছিলো মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তাই বনহুর নিজের পরিচয় গোপন করে দেখলো মেয়েটি তাকে চেনেনা শুধু জানতো তার নামটা। আরও একটা কারণে সে নিজের পরিচয় দেয়নি সে হলো শামীমা নিশ্চয়ই তার ভাইএর মৃত্যু ব্যাপার নিয়েই ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে এসেছে এবং তার পরিচয় পেলে ব্যাপারটা বলবে। তখন ছেলেরা সবাই জেনে নেবে এ সব তাদের হাসান ভাইএর কাজ। বনহুর আত্মগোপন করে কাজ করে যাবে এই তার উদ্দেশ্য। বললো বনহুর—মেয়েটি আমায় চেনেনা সত্য।

এবার হীরা বলে উঠে—ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে তার কি প্রয়োজন ছিলো তাতো জেনে নিলে না তুমি?

আমি জানি সে কি বলতে এসেছিলো।

তুমি জানো?

হাঁ।

কি প্রয়োজনে মেয়েটি তোমার কাছে এসেছিলো বলোনা হাসান ভাই?

বলছি। ঐ মেয়েটি দালাল নেতা রিয়াজ আলীর বোন।

রিয়াজ আলীর বোন?

হাঁ, সে এসেছিলো আমার কাছে জানতে কে বা কারা তার ভাইকে এ ভাবে—মানে এ অবস্থা করেছিলো।

ও এবার বুঝতে পেরেছি ঐ মেয়েটি আমাদের মানে মুক্তি বাহিনী ছেলেদের সন্দেহ করে।

হাঁ ঠিক্ তাই।

তবে ও বললোনা কেনো?

জানে সবার কাছে বলে কোন ফল হবেনা। সে ক্যাপ্টেনের মুখে শুনতে এসেছিলো। যাক ওরা ওকে ঠিক পৌছে দিয়ে চলে আসবে। তোমরা সবাই শোবে যাও রাত অনেক হয়েছে। আর শোন কাল তোমাদের মসিপুরে সাকো তৈরি ব্যাপারে যেতে হবে। মসিপুরে সাকোটা খান সেনারা নষ্ট করে দিয়েছে কাজেই মসিপুরের লোকদের খুব কষ্ট হচ্ছে। সাকো নষ্ট হওয়ায় তারা হাট বাজারে যেতে পারছেনা। এ গ্রামের সবই গরিব, সাকো তৈরি ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য না পেলে ওরা কিছুই পারবে না। ওদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করবার জন্য তোমরা শীঘ্র কাজে নেমে পড়বে।

হাসানের কথায় সবাই সম্মতি জানিয়ে সেই রাতের মত বিদায় গ্রহণ করলো।

হাসান নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলো।

❑

হাসান শুয়ে শুয়ে এ পাশ ও পাশ করছে। একটু আগে ফিরে এসেছে হারুন ও খালেদ শামীমাকে পৌছে দিয়ে।

এখন আকাশ মেঘমুক্ত হলেও খুব পরিস্কার হয়নি। হাসান হাত ঘড়িটা দেখে নিলো রাত এখন দু'টো বাজে। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়লো হাসান, তার ছোট্ট সুইটকেশটা খুলে বের করে নিলো জমকালো পোশাকটা। পোশাকটা পরে নিয়ে বেরিয়ে এলো তাঁবুর বাইরে।

অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে চললো হাসান মাঠের মধ্য দিয়ে। কখনও আইল ধরে কখনও বা পায়ে চলা পথ বেয়ে এগিয়ে চললো।

রিয়াজ আলীর বাড়ির দরজায় এসে থামলো সে।

সেদিন শামীমা বলেছিলো ওদিকের ঘরটায় শোয় সে? ঐ জানালা দিয়েই নাকি শামীম দেখতো তার ভাই এর কীর্তি কলাপ।

ক্যাপ্টেন হাসান শামীমার জানালায় মৃদু টোকা দেয়। একবার দু'বার তিনবার। জানালা খুলে যায় বলে—কে?

আমি হাসান।

অন্ধকারে শামীমা চিনতে পারে হাঁ হাসানই বটে, শরীরে তার জমকালো পোশাক। বলে শামীমা—আপনি এসেছেন?

হাঁ, শুনলাম তুমি নাকি আমাদের ক্যাম্পে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম?

কেনো?

ক্যাপ্টেন হাসান আমি জানতাম আপনি অতি মহৎ কিন্তু.......

থামলে কেনো বলো?

আপনি আরও সরে আসুন না হলে কেউ দেখে ফেলবে।

হাসান আরও সরে দাঁড়ালো জানালার পাশে।

শামীমা বললো—আপনি আমার ভাইজানকে এভাবে কষ্ট দেবেন আমি ভাবতে পারিনি।

তুমি কি এ কথাটাই আমাকে বলতে গিয়েছিলে?

না আমি জানতে গিয়েছিলাম কেনো আপনি ভাইজান ও তার দলবলের এ অবস্থা করেছিলেন? এ ছাড়া কি তাদের জন্য অন্য শাস্তি ছিলোনা?

না।

কেনো পুলিশের হাতে দিলেই পারতেন?

ক্যাপ্টেন হাসান কোনদিন দোষীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়না শামীমা। তুমি শোন তোমার ভাই যে অপরাধ করেছিলো তার উপযুক্ত সাজা আমি দিয়েছি। শুধু তাকেই নয় আরও অনেক ব্যাক্তিকে আমি ঐরূপ সাজা দেবো কারণ তারা শুধু বাংলার শত শত নিরীহ মানুষ হত্যাই করেনি শত শত বোনের ইজ্জত লুটে নিয়েছে। নিজেদের মা বোনকে তুলে দিয়েছে বর্বর খান বাহিনী যোয়ানদের হাতে। যাক্ তুমি ভাইএর জন্য আপসোস করোনা শামীমা। বাংলার ঘরে ঘরে তোমার লক্ষ লক্ষ ভাই তোমাদের ইজ্জত রক্ষার জন্য, তোমাদের সুখ শান্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শামীমা তুমি ভুলে যাও তোমার ঐ অসৎ জানোয়ার ভাইএর কথা।

হাসানের কথাগুলো শামীমার হৃদয়ে অনাবিল শান্তি এনেদিলো? সত্যি তার ভাই যে জঘন্য কাজ করেছে ঠিক তারই উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছে। সত্যি তো বাংলার লক্ষ লক্ষ যুবক তার ভাই। আজ তারাই তো বুক ভরা আশা ভরসা নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে মা বোনদের পাশে এসে দাঁড়াবে। যে মায়েরা সন্তান হারিয়েছে—যে বোনেরা ভাই হারিয়েছে তাদের চোখের পানি মুছিয়ে দেবে তারা, হাসি ফোটাবে তাদের মুখে। শামীমা বলে এবার—একটা কথা বলবো।

বলো?

আমি কি দেশ গড়ার কোন কাজে আপনাদের সাহায্য করতে পারিনা?

নিশ্চয়ই পারো।

তা হলে আমাকে যদি আপনারা কাজ দিতেন আমি মাথা পেতে করবো।

বেশ, যখন প্রয়োজন হয় ডাকবো।

আমি প্রতিক্ষা করবো আপনার।

চলি তাহলে?

হাসান চলে গেলো। শামীমা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারময় জানালার পাশে।

❑

মসিপুর সাকো মেরামত কাজে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হাসান নিজেও কাজ করে চলেছে। গ্রামের অনেক চাষীগণ এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। কোদাল চালাচ্ছে কেউ, কেউ বা ঝাঁকায় মাটি নিয়ে সাঁকোর পাশে ফেলছে কেউ খুঁটি কাটছে, কেউ গর্ত করছে।

ক্যাপ্টেন হাসানের উৎসাহে উৎসাহিত সবাই। কারো মুখে এতোটুকু ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন নাই। হাসান নিজেও কোদাল চালাচ্ছে।

সবাইকে বলেছে হাসান তোমরা সকলে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তোমাদের সকলের সহায়তা না পেলে বর্বর হানাদার দ্বারা বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনরায় স্বাভাবিক করা সম্ভব হবেনা। বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে হতে হবে চরিত্রবান; আদর্শ, মহৎ তাহলেই সোনার বাংলা সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হবে। সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে অক্লান্তভাবে। আত্মত্যাগ দিতে হবে। পরের মুখোপেক্ষী হওয়া কোনদিন উচিৎ নয়। কারণ বাংলাদেশ তোমাদেরই দেশ, এদেশের প্রতিটি জিনিস তোমাদের। কাজেই তোমাদের কর্তব্য নিজের দেশকে সুন্দর আদর্শ দেশ হিসাবে তোমরা গড়ে তুলবে। দুর্নীতি অন্যায় অবিচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। সংগ্রাম করেছো আরও সংগ্রাম করতে হবে। তোমরা নিজের হাতে কাজ করবে কেউ তোমাদের আদেশ দেবে বা অর্থ সাহায্য করবে সে আশা তোমরা করোনা। কারণ বর্বর খান বাহিনীর বাংলার সকল সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে এবং ধ্বংস করে রেখে গেছে সব কিছু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মহান নেতা তার বাণী সব সময় স্মরণ রাখবে। আমাদের জীবনে এমন নেতা কোনদিন পাইনি যিনি প্রধানমন্ত্রির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও বাংলার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এক মন এক প্রাণ হয়ে গেছেন। তিনি জনগণের বন্ধু, তাঁর প্রতিটি কথা বাংলার মানুষের অন্তরের কথা। বাংলার মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার সঙ্গে জড়িত তার জীবন।

হাসানের কথাগুলো তার সহকর্মীদের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ দান করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলো সে। বলে হাসান—বঙ্গবন্ধু বলেছেন শোষনমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। তোমরা তার এই কথাটা মুহূর্তের জন্য ভুলবেনা যেখানেই দেখবে দুর্নীতি আর শোষণ সেখানেই তোমরা রুখে দাঁড়াবে অন্যায়কে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবেনা। হাঁ, আরও একটি কথা সব

সময় খেয়াল রাখবে যে, তোমার পিতা হলেও ক্ষমা নেই যদি সে অন্যায় করেন। দেশ থেকে অন্যায়কে নিঃশেষ করতে হবে, মুছে ফেলতে হবে সমস্ত গ্লানি। তবেই বাংলাদেশ হবে সুন্দর সার্বভৌম এক রাষ্ট্র। মান সম্মান নিয়ে কেউ কোনদিন আত্মগর্বে গর্বিত হবে না, সবাই মনে করবে আমরা মানুষ। তোমাদের মধ্যে থাকবেনা কোন জাতিভেদ, থাকবে না ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ থাকবেনা সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার। একই দেশের মানুষ তোমরা, সবাই তোমরা ভাই ভাই। হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যাবে পরের দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনাকে নিজের বলে গ্রহণ করবে। পরের সাহায্যে আত্মউৎসর্গ করবে। তোমরা তো জানো খান বাহিনী আমাদের বাংলাদেশের সমস্ত কলকারখানা, বড় বড় পুল সাঁকো, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এগুলো তোমাদের গড়তে হবে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে সব কিছু। তোমরা সবাই মিলে যদি সরকারের কাছে এ সব ব্যাপারে দাবী জানাও তাতে কোন ফল হবে না কারণ বাংলাদেশ সরকার আজ নিঃস্ব। তবু যতদূর সম্ভব দেশকে আবার গড়ে তোলার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের জনগণ যেন কষ্ট না পায় সে জন্য বঙ্গবন্ধুর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। তিনি পরিশ্রম করে চলেছেন। বাংলার জনগণের জন্য তিনি নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তোমরাও বাংলার মানুষ, তোমাদের মহান নেতার আদর্শকে গ্রহণ করে নিজেদের দেশ গড়ার কাজে উৎসর্গ করে দাও।

কথাগুলো বলতে বলতে ক্যাপ্টেন হাসানের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠে। নিজ হাতে সে কোদাল চালিয়ে মাটি কাটছিলো।

এগিয়ে আসে ফরিদ—হাসান ভাই কোদালটা আমাকে দাও, তুমি তাবুতে গিয়ে বিশ্রাম করোগে বড্ড রোদ......

হাসলো হাসান, ডান হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেলে বললো—ফরিদ আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হইনি। এর চেয়ে বেশি পরিশ্রম করা আমার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া তোমরা বাচ্চা ছেলেরা কাজ করে চলেছো আর আমি যাবো বিশ্রাম করতে এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন হাসান আর ফরিদ যখন কথা হচ্ছিলো তখন হীরা একটা তরুণকে সঙ্গে করে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। বলে হীরা—এই যুবকটি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করবে বলে এসেছে।

হাসান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকায় তরুণটির মুখের দিকে তারপর বলে—পারবে কোদাল চালাতে?

তরুণটি জবাব দেয়—পারবো।

ফরিদ বলে উঠে—ও পারবে বলে মনে হয়না।

তরুণটি একটু রাগত ভাব নিয়ে বলে—তোমরা যদি পারো আমি কেনো পারবোনা। আমি কি মানুষ না?

হাসান হেসে বললো—নিশ্চয়ই তুমি মানুষ এবং পারবে! যাও ফরিদ তোমরা কাজ করোগে। হীরা একে একটি কোদাল দাও।

হীরা একটি কোদাল এনে দিলো।

হাসান বললো—তোমার নাম কি তাতো বললেনা?

তরুণটি জবাব দিলো—শামীম।

চমৎকার নামটা। বেশ এই নাও—হীরার হাত থেকে কোদালটা নিয়ে শামীমের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

শামীম কোদাল হাতে নেয়।

হীরা আর ফরিদ চলে যায় নিজেদের কাজে।

শামীম কোদাল চালায়।

হাসান কোদাল দিয়ে মাটি কেটে চলেছে।

অল্পক্ষণে হাঁপিয়ে পড়ে শামীম।

হাসান মৃদু হেসে বলে—বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছো, যাও তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করোগে।

না আমি যাবোনা। তাছাড়া হাঁপিয়েও পড়িনি মোটেই।

বেশ কাজ করো।

শামীম শেষ পর্যন্ত কাজ করে চললো।

অনেক ছেলে, অনেক যুবক, চাষী বৃদ্ধ এসে কাজে যোগ দিয়েছিলো কাজেই সন্ধ্যা নাগাদ সাঁকোটা তৈরি হয়ে গেলো।

সবাই ফিরলো হলুদখালি ঘাঁটি অভিমুখে।

শামীমা তার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য হাসানের অনুমতি চাইলো, হাসান বললো যাও।

পরদিন আবার এলো শামীমা।

হলুদখালির মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা ওর চমৎকর ব্যবহারে খুশি হলো। ছেলেরা তার বয়সের অনুপাতে কাজ করে বেশি। তাছাড়া ওর সুন্দর চেহারা আকৃষ্ট করলো সবাইকে।

সেদিন শিবপুরে সবাই গেলো সেখানের গরিব চাষীদের বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর মেরামত করে তাদের মাথা গোজার আশ্রয় করে দেবার জন্য তারা ক'দিন থেকে অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছে।

আজ শামীমও গেলো তাদের সঙ্গে।

হাসান নিজের হাতে দা কুড়াল নিয়ে বাঁশ কেটে খুটি তৈরি করে দিচ্ছে।

অন্যান্য সবাই কেউ গর্ত খুড়ছে, কেউ চালা তৈরি করছে। কেউ বা কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। শিবপুরের প্রায় পুরুষদের হত্যা করেছে খান বাহিনী। যারা বেঁচে আছে শুধু নারী আর শিশু। এরা তো পারেনা ঘর-দোর

তৈরি করে নিতে। কাজেই মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা এসেছে তাদের পোড়া বাড়ি ঘর মেরামত করে দিতে।

হাসান খুঁটি তৈরি করে দিচ্ছিলো শামীম সে গুলোকে গুছিয়ে রাখছিলো।

এমন সময় একটা বৃদ্ধা পিছন থেকে এসে হাসানকে ধরে ফেলে—বাবা জলিল তুই এখানে কাজ করছিস আর আমি তোকে কত জায়গায় খুঁজে মরছি। বাবা—বাবা জলিল......কেঁদে উঠে বৃদ্ধা হাঁউ মাঁউ করে।

কয়েকজন ছেলে দ্রুত এগিয়ে আসে বৃদ্ধাকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

হাসান বলে উঠে—থাক ওকে ছাড়াতে চেষ্টা করোনা। নিশ্চয়ই খান সেনারা ওর ছেলেকে হত্যা করেছে।

একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলো ভীড় ঠেলে, বললো সে—ওর একমাত্র ছেলে ছিলো জলিল, তাকে খান বাহিনী ওরই সম্মুখে গুলি করে হত্যা করেছিলো তারপর থেকে ও পাগল হয়ে গেছে। ছেলেটি বড় সুন্দর ছিলো তাই আপনাকে দেখে ও অমনভাবে ধরে ফেলেছে।

হাসান বললো—মা আমি তোমার জলিল। বলো কি নেবে?

কি নেবো? আমি রক্ত নেবো যারা আমার সোনার মানিককে হত্যা করেছে আমি তাদের রক্ত নেবো। হাসানকে মুক্ত করে দিয়ে হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ করে বৃদ্ধা, মনে হয় এই মুহূর্তে যদি তাদের পায় তাহলে সে ওদের মাংস ছিঁড়ে ফেলবে টুকরো টুকরো করে।

বৃদ্ধা আপন মনে বিড় বিড় করে কি সব বলতে থাকে। তারপর হঠাৎ মাটিতে উঁবু হয়ে মাথা ঠুকে কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমার বাবা জলিলকে এনে দাও খোদা। আমার জলিলকে এনে দাও। শুকনো মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্ত বেরিয়ে পড়লো বৃদ্ধার মাথা থেকে।

হাসান তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে তুলে নেয়, নিজের হাতে ওর চোখের পানি মুছিয়ে দেয় সে। বৃদ্ধার অবস্থা দেখে হাসান ও অন্যান্যদের চোখেও পানি এসে গিয়েছিলো।

বৃদ্ধা এবার হেসে উঠলো আমার জলিল আসবে। আমার জলিল আসবে......চলে গেলো সে সামনের দিকে।

অবাক হয়ে হাসান তাকিয়ে ছিলো আপন মনেই বললো—বর্বর জল্লাদ খান সেনাবাহিনী এমনি কত মাকে পাগল করেছে তার কোন হিসাব নাই। বেচারী মা আজ পথে পথে তার জলিলকে খুঁজে ফিরছে।

শামীম নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো হাসানের মুখের দিকে। হাসানের মাধ্যমে দেখতে পায় অদ্ভুত এক মানুষকে। যে মানুষটির তুলনা হয়না কারো সঙ্গে।

দৃষ্টি ফেরাতেই হাসানের সঙ্গে শামীমের দৃষ্টি বিনিময় হয়।

দৃষ্টি নত করে নেয় শামীম। আবার কাজে মনোযোগ দেয় সে। প্রখর রৌদ্রের তাপে মাটি যেন আগুনের মত গণগণে হয়ে উঠেছে। সাবল চালিয়ে মাটি খুঁড়ছিলো শামীম তখন।

কয়েকদিন হলো কাজ চলেছে।

অনেকগুলো বাড়িঘর আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লোকজন আবার তাদের বিধ্বস্ত বাড়িতে বাসা বাঁধছে। দুটো হাঁড়ি কুঁড়ি কিনে আবার তাতে রান্না চাপিয়েছে।

শিবপুর, মধুপুর, বাসব নগর, কাজল পাড়া এমনি আরও কতকগুলো গ্রাম একেবারে যেগুলো খান সেনা বাহিনী ধ্বংস করে ফেলেছিলো সেগুলো আবার গড়ে উঠলো। ক্যাপ্টেন হাসান ও বাংলার ছেলেরা মিলে এসব গ্রাম গুলোকে আবার তারা জাগ্রত করে তুললো। অবশ্য এরজন্য প্রত্যেককে অবিরাম পরিশ্রম করতে হলো। স্বার্থ ত্যাগ করে সবাই এগিয়ে এসেছিলো ক্যাপ্টেন হাসানের ডাকে। সে বলেছিলো—আমার ভাইরা তোমরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বৃষ্টি আর বন্যার পানিতে ভিজে রৌদ্রে পুড়ে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য লড়েছো। বাংলাকে রক্ষার জন্য বাংলার মানুষকে বাঁচাবার জন্য তোমরা যা করেছো ইতিহাসের পাতায় তা চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। তোমাদের এই ত্যাগ কোনদিন কেউ ভুলবেনা। অতীতে একদিন সবাই তোমরা হারিয়ে যাবে কিন্তু কালের সাক্ষী হয়ে তোমরা বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। আমার মুক্তি পাগল ভাইরা তোমরা যেমন প্রাণ দিয়ে দেশকে শত্রু মুক্ত করেছো তেমনি এখন অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ গড়ার কাজে আত্ম নিয়োগ করো। বাংলার প্রতিটি মানুষ তোমাদের আপন জন। কাজেই তোমরা সবাই সকলের মঙ্গল কামনা করবে এবং সবাই মিলে কাজ করে যাবে।

মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা ক্যাপ্টেন হাসানের কথাগুলো অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে গিয়ে গ্রাম বাসীদের সর্বভাবে সহায়তা করেন।

অবিরাম পরিশ্রম করে চলে ক্যাপ্টেন হাসান ও তার দলবল শামীম কিন্তু সব সময় রয়েছে তাদের সঙ্গে অবশ্য গোটাদিন সে এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করে সন্ধ্যায় সে ফিরে যায় নিজের বাড়িতে।

কাজের ফাঁকে এক সময় ক্যাপ্টেন হাসান বললো—আজ রাতে তোমরা প্রস্তুত থাকবে হাতীমারী বিহারী কলোনীতে হানা দিতে হবে। সেখানে এখনও কিছু সংখ্যক খান সেনা আত্মগোপন করে আছে।

সবাই কথাটা শুনে বিস্ময়ে চমকে উঠলো।

একজন বললো—হাসান ভাই আশ্চর্য এখনও হাতীমারী কলোনীতে খান সেনা আত্মগোপন করে আছে বলো কি?

হাঁ সত্য। তাছাড়া সেখানে নাকি এখনও অনেক অস্ত্র শস্ত্র আছে। সেখানে কোন এক গুদামে অনেকগুলি মেয়ে মানুষকে এখনও আটক রাখা হয়েছে। আজ রাতের অন্ধকারে আমি হাতীমারী বিহারী কলোনী ঘেরাও করবো। তোমরা সাহায্য করবে আমাকে।

এক সঙ্গে বলে উঠে সবাই—হাসান ভাই আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা সবাই মিলে আপনাকে সাহায্য করবো।

হাসান হাসি মুখে বললো—তোমাদের কথায় আমি খুশি হলাম।

রাত্রির অন্ধকারে ক্যাপ্টেন হাসান যখন তার ড্রেস পরে নিচ্ছিল তখন শামীম এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

হাসান চোখ তুলে তাকালো শামীমকে দেখে একটু অবাক হলো...তুমি আজ বাড়ি যাওনি শামীম?

না।

আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

এবার হেসে বললো—শামীম তুমি যেওনা।

কেনো?

বলছি তুমি যেওনা। হাসান তাকিয়ে দেখে নেয় এখানে আর কেউ নেই। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা তাদের তাবুতে তৈরি হচ্ছে। হাসান কয়েক পা সরে আসে শামীমের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—সত্য তোমার আত্মত্যাগ আমাকে মুক্ত করেছে শামীমা।

বিস্ময় ভরা চোখ তুলে তাকায় শামীম, বলে আমার নাম শামীমা নয় শামীম।

হেসে বলে হাসান...সবার চোখে ধূলো দিতে পারো কিন্তু আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না। শামীমা তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, তোমার ছদ্মবেশ নিখুঁত হয়েছে। কিন্তু কেনো তোমার এ আত্মগোপনতা জানতে পারি কি?

এবার শামীম বলে—শুধু ক্যাপ্টেন হাসানকে আবিষ্কার করাই ছিলো আমার মূল উদ্দেশ্য। তাই আমি পুরুষের ছদ্ম বেশে এসেছিলাম আপনার দলে যোগ দিতে। কিন্তু আপনি কেনো আমার কাছে আত্মগোপন করেছিলেন বলুনতো?

হাসলো হাসান, তার হাসির মধ্যে গভীর এক রহস্য পূর্ণ ভাব ফুটে উঠলো। কোন জবাব দিলো না সে শামীমের প্রশ্নের। কোমরের বেল্টটা বাঁধতে বললো হাসান—শামীম বলেই আমি তোমায় ডাকবো। শোন আজ তুমি আমাদের সঙ্গে যেওনা। কারণ সেখানে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

বেশ আপনার কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আমাকে আপনি কোনদিন ঠেলে দিবেন না। আমি সবার সঙ্গে মিশে দেশ গড়ার কাজ করতে চাই।

শামীম তোমার কথা শুনে সত্যি আমি যার পর নাই খুশি হলাম। কোন দিন তুমি আমার কাছে অবহেলা পাবে না। যাও এবার তুমি বাড়ি ফিরে যাও শামীম, কাল আবার দেখা হবে।

আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো—হাসান ভাই বলে ডেকো।

বেশ তাই ডাকবো।

শামীমা দীপ্ত দৃষ্টি মেলে তাকায় একবার ক্যাপ্টেন হাসানের মুখে তারপর বেরিয়ে যায় সে তাবু থেকে।

বাড়ির পাশে এসে পুরুষের বেশ পরে ফেললো শামীমা তারপর পা টিপে টিপে প্রবেশ করলো অন্ত পুরে। নিজের ঘরের দরজা খুলে যেমন সে ভিতরে প্রবেশ করতে যাবে অমনি রুদ্র মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে এলো শামীমার ভাবী কুলসুম। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এতোরাত কোথায় ছিলি হারাম জাদী? লজ্জা করেনা এ বাড়িতে ঢুকতে? এগিয়ে গিয়ে বজ্র মুষ্টিতে চুল ধরে টেনে বের করে আনে ঘর থেকে—বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শয়তানী! এ বাড়িতে তোর জায়গা হবে না। ধাক্কা দিয়ে উঠানে ফেলে দিলো কুলসুম শামীমাকে।

উঠানে একটা ইট পড়ে ছিলো, শামীমার ললাট কেটে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

এতক্ষণে কুলসুমের বড় ছেলে জেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করে—এতোক্ষণে বুঝি নবাব জাদী বাড়ি ফিরলো?

হাঁ দেখিসনা চোরের মত চুপি চুপি বাড়ি ঢুকছিলো। বের করে দে, বাড়ি থেকে বের করে দে আমজাদ।

আমজাদ এগিয়ে এসে পা দিয়ে একটা লাথি দিলো শামীমার পাঁজরে। তারপর বললো—চলো মা ও এখানেই পড়ে থাক। শোবে চলো।

পুত্রের কথায় কুলসুম বললো—হারাম জাদী আবার যদি বাড়ি থেকে বের হবি তা হলে......কথা শেষ না করেই পুত্রের সঙ্গে শোবার ঘরে চলে যায়।

অন্ধকার উঠানে পড়ে পড়ে কাঁদে শামীমা, কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে চোখে মুখে প্রবেশ করে। হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে কিন্তু এতো বেশি রক্তপাত হচ্ছিলো তাতে হাত জামা কাপড় ভিজে যায়।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে এক সময় উঠে দাঁড়ায় শামীমা। নিজের ঘরে প্রবেশ করে অন্ধকারেই বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে বালিশটা রক্তে ভিজে উঠছে। আজ নতুন নয় এমনি অবস্থা তার ছোট বেলা থেকেই। কত মার সে খেয়েছে তার ভাবীর হাতে, দেহের কত জায়গা না কেটে গেছে ওর কিন্তু শামীমা কোনদিন প্রতিবাদ করেনি। সে জানে এ পৃথিবীতে তাকে দয়া করার মত কেউ নেই; পালিয়েই বা কার কাছে যাবে। কে তাকে আশ্রয় দেবে। মার গাল খেয়েই শামীমা রয়ে গেছে ভাই ভাবীর সংসারে।

ভাই তার মায়ের পেটের সন্তান নয়। ভাবীও তার আপন জন নয় কাজেই শামীমা কারো কাছে পায়নি এতোটুকু স্নেহ বা আদর। মা বাবা তো ছোট বেলাতেই চলে গেছে, স্নেহ ভালবাসা কি জিনিস জানে না শামীমা। এ অবস্থার মধ্যে শামীমা অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিলো কিছু। এজন্যও তাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কতদিন স্কুল থেকে এসে দেখেছে তার জন্য কিছু খাবার নেই। অথচ ভাই-এর ছেলেমেয়েদের জন্য ঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকতো। শামীমা নিজের জন্য ভাবতোনা বেশি ভাবতো ছোট ভাই সিমুর জন্য সে খিদে সহ্য করছে কিন্তু সিমু সহ্য করতে

পারে। কোন কোন দিন অল্প কিছু খাবার থাকতো। শামীমা নিজে না খেয়ে ভাইকে খাইয়ে দিতো। নিজে এক গেলাস পানি খেয়ে নিতো।

অন্য একটি বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলো সিমু, তার কান্নার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠবে তাই জোরে কাঁদেনা শামীমা। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

❑

হাতীমারী কলোনী।

কতকগুলো অবাঙ্গালী বসে বসে গোপনে দরবার করছে। তাদের মধ্যে আছে পনেরো জন খান সেনা। এই খান সেনাদেরকে অবাঙ্গালীরা লুকিয়ে রেখেছে গোপনে। রিয়াজ আলী ও আরও কয়েকজন দালাল ছিলো এদের সহায়ক। অবাঙ্গালীদের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী দালাল এখনও এদের সঙ্গে আত্মগোপন করে আছে। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও এরা বেশ আরামেই আছে, কারণ খাদ্য পানীয় সব কিছু পাচ্ছে। এমন কি কতকগুলো অসহায় বাঙ্গালী তরুণীকে একটা গুদামে আটক করে রেখেছে তাদের উপর চলেছে খুশিমত পাশবিক অত্যাচার।

আজকের বৈঠক রিয়াজ আলীও তার সঙ্গীদের হত্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন হাসান ও তার দলবল এসে আচমকা ঘেরাও করে ফেলে সমস্ত কলোনীটা। আজ হাসানের সঙ্গে আছে রহমান ও তার দলবল। সকলের হাতে অস্ত্র বর্শা, বল্লম, ছোরা, বন্দুক ও রাইফেল? ক্যাপ্টেন হাসানের হাতে রিভলভার।

এমন সতর্কতার সঙ্গে হাসানের দল কলোনী ঘেরাও করলো একজনও কলোনী ছেড়ে পালাতে সক্ষম হলোনা। মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা অস্ত্র হাতে কলোনীর চারপাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্যাপ্টেন হাসান হাতীমারী কলোনী ঘেরাও করার পূর্বে হাতিমারীর পুলিশ অফিসে জানায় পুলিশ সুপারকে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলো। পুলিশ সুপারও দু'জন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়েছিলো সে উদ্দেশ্যে, ওদের বন্দী করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।

হাসানের শরীরে আজ জমকালো পোশাক নয় মুক্তি বাহিনীদের ক্যাপ্টেনের পোশাক ছিলো। ওকে আজ বড় সুন্দর লাগছে।

কলোনী ঘেরাও করার পর ক্যাপ্টেনের সুপার সহ কলোনীর ভিতরে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কলোনীর ভিতর থেকে গোলাগুলি নিক্ষেপ।

পাল্টা জবাব দিতে লাগলো হাসানের দল।

ক্যাপ্টেন হাসান পুলিশ সুপার এবং রহমান গা ঢাকা দিয়ে এগুতে লাগলো। কয়েকজন পুলিশও আছে তাদের সঙ্গে।

যে কক্ষমধ্যে অবাঙ্গালী নেতাগণ ও খান সেনাবাহিনীর পনেরোজন আর বাঙ্গালী কয়েকজন দালাল বসে সলা পরামর্শ করছিলো ক্যাপটেন হাসান সব বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে দলবল সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করে।

শুরু হয় তুমুল লড়াই।

ক্যাপটেন হাসান দক্ষতার সঙ্গে সবাইকে পরাজিত করে। বন্দী করে সব গুলোকে।

হাতীমারীর পুলিশ সুপার এবং পুলিশ অফিসারগণ ক্যাপটেন হাসানের যুদ্ধ কৌশল লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে যায়।

অবাঙ্গালী প্রায় বিশ জন, পনেরো জন খান সেনা, এবং বাঙ্গালী দালাল ছয় জন বন্দী হলো।

এবার খানা তল্লাসী চললো কলোনীর মধ্যে। ক্যাপেটেন হাসান জানতো এই কলোনীর মধ্যেই কোন গোপন স্থানে আছে অগণিত অস্ত্রশস্ত্র এবং কোন গোপন গুদামে আছে কিছু সংখ্যক অসহায়া তরুণী।

হাসান ও তার দলবল যার সঙ্গে কলোনীর ভিতরে প্রবেশ করেছিলো তারা সবাই সন্ধান চালাতে লাগলো। একটা ভাঙ্গাচুরা দালানের মধ্যে পাওয়া গেলো বিপুল অস্ত্র। পুলিশ সুপার এসব অস্ত্র উদ্ধার করে অফিসে নিয়ে যাবার জন্য আর একজন পুলিশ অফিসারকে আদেশ দিলেন তিনি নিজে ক্যাপেটেন হাসানের সঙ্গে থেকে দেখতে লাগলেন।

ক্যাপটেন হাসানকে যতই দেখছেন ততই যেন বিস্মিত হচ্ছেন। এমন যুবক তিনি এর পূর্বে দেখেন নাই। যার মধ্যে এমন কর্মদক্ষতা রয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই গুদামখানা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো হাসান। একটা বদ্ধ গুদামের মধ্যে প্রায় বিশ পঁচিশজন তরুণীকে এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পেলো তারা।

ক্যাপটেন হাসান ও তার সঙ্গীদের দেখে তরুণীগুলো লজ্জায় মুখ নত করে নিলো কেউ বা মুখ ঢেকে ফেললো দু'হাতের মধ্যে।

হাসান লক্ষ্য করলো তরুণীগুলো প্রায়ই ষোল থেকে বিশ বাইশ বছরের মধ্যে। কয়েকজন পল্লী তরুণী ছাড়া সবাইকে শিক্ষিত বলে মনে হলো। এ সব তরুণীদের মধ্যে অনেককেই গর্ভবতী অবস্থায় দেখা গেলো।

হাসান ও তার সঙ্গীদের দেখে তরুণীদল কাঁদতে শুরু করলো। লজ্জায় ক্ষোভে কেউ যেন তারা মুখ দেখাতে পাচ্ছিলোনা। হাসান তরুণীদের মনের অবস্থা বুঝতে পারলো হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করলো, সে নিজেও যেন

এদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলোনা লজ্জা বোধ হচ্ছিল। নিজকে সহজ করে নিলো হাসান তারপর বললো—বোন তোমরা কেঁদনা, এখন তোমরা সবাই মুক্ত? আর কোন পিশাচ তোমাদের উপর অত্যাচার করতে সক্ষম হবে না।

তরুণীদের একজন বলে উঠলো—এ মুখ আমরা আর কাউকে দেখাতে চাইনা। আমাদের মেরে ফেলুন। আমাদের হত্যা করুন......আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মেয়েটি।

পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য সবাই যেন হতবাক হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থায় তারা কোনদিন দেখেনি। তরুণীদের চুল এলোমেলো, দেহের বসন ছিন্নভিন্ন। চিবুকে গন্ডে গলায় কাঁধে পিশাচ খান হানাদারদের দংশনের চিহ্ন। বর্ণনাতীত অবস্থা এক একজনের।

হাসান বললো—তোমাদের এ অবস্থার জন্য তোমরা তো দায়ী নও? কেনো তোমরা নিজেদের জীবন বিনষ্ট করতে চাও? তোমরা আমাদেরই মা বোন, তোমরা ফিরে চলো।

পুলিশ সুপার লোকমান হোসেন বললেন—হাঁ সমাজ আপনাদের স্থান দিতে বাধ্য বঙ্গবন্ধু বলেছেন—আপনারা নারী সমাজে শীর্ষ স্থানীয় কারণ আপনাদের ইজ্জতের বিনিময়ে তো আমরা লাভ করেছি আমাদের বাংলাদেশ। চলুন আপনারা, আমরা সমাজে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করবো।

পুলিশ সুপার মিঃ হোসেন হাতীমারী কলোনী থেকে অবাঙ্গালী দালালগণ সহ পনেরোজন খান সেনা এবং ছয়জন বাঙ্গালী দালালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললো। আর নির্যাতীতা তরুণীদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলো ক্যাপটেন হাসান। কথায় কথায় জানতে পারলো হলুদখালি চৌধুরী বাড়ির ছেলেরা বৌ আছে এই তরুণীদের মধ্যে।

ক্যাপটেন হাসান চৌধুরী সাহেবকে ডেকে পাঠালো হলুদখালি ঘাঁটিতে।

চৌধুরী আরিফ আহম্মদ এসে হাসান তাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনার পুত্রবধূ কোথায়?

আরিফ আহাম্মদ কথাটা শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন পরে বললেন—বৌমা এখন মায়ের বাড়িতে।

হাসানের ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো, ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—মিথ্যা কথা।

নানা সত্যি বলছি......আমতা আমতা করে বলে চৌধুরী সাহেব।

হাসান গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আপনি না হজ করে হাজী হয়ে এসেছেন অথচ এতো বড় মিথ্যা বলতে আপনার বাঁধলোনা? এবার ডাকলো—হীরা।

তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো হীরা—হাসান ভাই বলো?

ওকে নিয়ে এসো।

হীরা চলে গেলো একটু পরে একটি ঘোমটা ঢাকা তরুণীর সহ উপস্থিত হলো তাদের সম্মুখে।

হাসান সরে এসে বাম হাতে আলগোছে তরুণীর ঘোমটা খুলে ফেললো বললো—দেখুন একে চিনতে পারেন কিনা?

চৌধুরী সাহেব তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বললো—এ্যাঁ তুমি বেঁচে আছো?......

হাসান ব্যাঙ্গ পূর্ণ হাসি হেসে বললো—ও আপনি তা হলে ভেবেছিলেন আপনার পুত্র বধুর মৃত্যু ঘটেছে? তবে মিথ্যা কথা বললেন কেন আপনার পুত্র বধু নাকি তার বাপের বাড়ি আছে? হাসানের মুখোভাব কঠিন হয়ে উঠলো বললো—খান সেনাবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে গেছে এ কথাটা লোকে জানলে আপনার মান সম্মান সব খোয়া যাবে। এ জন্য আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। ভেবেছেন তার মৃত্যু ঘটেছে, আপনিও কলঙ্কের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। বলুন এ আপনার পুত্র বধু কি-না? বলুন চুপ করে রইলেন কেনো? বলুন?

হাঁ এ আমার পুত্র বধু।

সে নিজের ইচ্ছায় নয় বর্বর খান সেনা বাহিনীরা তাকে জোর পূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। তার নিজের কোন দোষ নাই কোন অপরাধ নাই। অথচ আপনি সেই নিষ্পাপ নিরোপরাধ পুত্র বধুর মৃত্যু কামনা করেছিলেন। দেখুন চৌধুরী সাহেব আপনার পুত্র বধুকে আপনি ঘরে নিয়ে যান।

চমকে চোখ তুলে তাকায় চৌধুরী সাহেব।

হাসান বললো—কি অমন চমকে উঠলেন কেনো?

চৌধুরী সাহেব মাথা চুলকে বললেন—আমাদের সমাজ আছে........

কথা শেষ করতে দেয়না হাসান কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠে—রেখে দিন আপনাদের সমাজ। সমাজ কারা তৈরি করেছে? আপনারাই তো সমাজের অধিপতি। শুনুন সমস্ত সমাজ ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলুন। সমাজ আমরা মানি না। নিয়ে যান আপনার পুত্র বধূকে' কন্যার স্নেহে বুকে তুলে নেন। আজ এর মত অসহায় আর কেউ নেই।

চৌধুরী সাহেব তবু মাথা নিচু করে রইলেন।

ক্যাপ্টেন হাসান বললো আবার—উঠুন নিয়ে যান ওকে সঙ্গে করে। এ ব্যাপারে সমাজে যদি কোন কথা উঠে তা হলে আমরা তাদের সায়েস্তা করবো। যান নিয়ে যান। হাঁ শুনুন শুধু আপনি নন যে সব মা বোন খান

সেনাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের সবাইকে সমাদরে সমাজে স্থান দিতে হবে।

চৌধুরী সাহেব বললেন—কিন্তু........

কোন কিন্তু নয় একটি কথাও আমরা শুনবো না। যান নিয়ে যান। মাসুমা যাও বোন তোমার শ্বশুরের সঙ্গে যাও।

হাসানের কথা অমান্য করতে পারেনা চৌধুরী সাহেব। তিনি পুত্র বধু মাসুমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলেন বাড়ির দিকে।

পরদিন আরো কয়েকজন অভিভাবককে ডেকে তাদের কন্যাদের সমর্পণ করলো হাসান। সবাইকে বুঝিয়ে দিল সে—এই সব অসহায়া মহিলাদের আপনারা যদি সমাজে স্থান না দেন তা হলে এরা লজ্জায় ক্ষোভে মৃত্যুসম অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বাংলার স্বাধীনতায় এই সব মা বোনদের দান সবচেয়ে বড়। কারণ নারীর ইজ্জৎ অমূল্য রত্নের চেয়েও মূল্যবান। এ সব মা বোনরা নিজেদের অমূল্য ইজ্জৎ বিলিয়ে দিয়ে বাংলা জননীকে মুক্ত করেছে কাজেই এরা অবহেলার পাত্রী নয়। আপনারা যার কন্যা, যার পুত্রবধু, যার স্ত্রী, সসানন্দে ঘরে নিয়ে যান। আপনারা এদের আদর যত্ন করবেন এরা যেন বুঝতে না পারে তারা লাঞ্ছিতা নির্যাতীতা।

অভিভাবকগণ ক্যাপটেন হাসানের কথাগুলে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন সত্যতো এই সব মহিলারা কোন অপরাধে অপরাধী নয়। স্বইচ্ছায় এরা যায়নি এদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো জোর পূর্বক। এদের আটক রেখে ওরা এদের উপর চালীয়েছে খুশীমত অত্যাচার। প্রায় মহিলার অবস্থাই সঙ্কটপূর্ণ? কয়েকজন ছাড়া প্রায়ই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা।

হাসান বললো—আপনাদেরই কন্যা মা বোন এরা। আপনারা এদের ফেলতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন কাজেই আপনাদের কোন অসুবিধা হবেনা। আপনারা শুধু এদের সমাজে স্থান দেন।

হাসানের কথায় কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারেনা। যার যার আত্মীয়দের তাঁরা নিয়ে যান বাড়িতে। কিন্তু এ একটি তরুণীর পক্ষ থেকে কেউ আসেনা।

তরুণীটি নীরবে রোদন করে চলছে।

হাসান তার কাজ শেষ করে ফিরে আসে তাঁবুর মধ্যে তরুণীটিকে দেখে সে বুঝতে পারে তরুণীটি শিক্ষিতা। হাসানকে তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে।

হাসান ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কোমল কণ্ঠে বলে—বোন কেঁদোনা। আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো জবাব দেবে তো?

দেবো। বললো তরুণী।

খান সেনারা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার পূর্বে কার বাড়ি ছিলে শ্বশুর বাড়ি না বাপের বাড়ি?

বিয়ে আমার হয়নি।

হাসান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিমেলে তাকালো তরুণীর দিকে। দীর্ঘদিন খান সেনাদের কবলে বন্দী থেকে অযত্নে অনাচার অত্যাচার নিষ্পেষিতা হলেও তরুণীটিকে দেখলে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। দীর্ঘ সুন্দর দেহ মাথায় রাশি কৃত কালো চুল রক্তাব গণ্ড। ডাগর ডাগর দুটি চোখ। কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

দেহের বসন ছিন্ন ভিন্ন হলেও সে বসন যে একদিন বেশ মূল্যবান ছিলো তা বেশ বোঝা যায়। গলায় এবং গালের কয়েক স্থানে পাপাচার খান হানাদারদের নখরের চিহ্ন ঠিক চাঁদে কলঙ্কের মত দাগ।

ক্যাপটেন হাসানও চট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না। ওর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো তারপর বললো—তোমার বাড়ি কোথায় বোন? বলো আমরা সেখানেই তোমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

বাড়ির ঠিকানা আমি বলবো না।

সে কি? তাহলে কেমন করে তোমাকে আমরা পৌঁছে দেবো।

বাড়ি আমি যাবো না।

এ তুমি কি বলছো?

হাঁ আমি জানি আমার জন্য সে পথ বন্ধ। কারণ আমার বাবা আমাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবেন না। আমার অনেকগুলো বোন আছে। আমাকে বাড়িতে আশ্রয় দিলে তাদের কারো বিয়ে হবে না। সমাজ আমার বাবাকে এক ঘরে করবে।

হাসলো হাসান, তারপর বললো—সমাজ! কোন সমাজ আমরা মানি না। মানুষ সমাজে মানুষের অধিকার পাবে এই আমরা জানি।

তাছাড়া আমি মা হতে চলেছি......

এ আর এমন কি কথা।

না না তা হয় না আমাকে আপনারা পারবেন না বাড়ীতে নিয়ে যেতে। আমি এ মুখ কাউকে দেখাতে পারবো না। আমি আত্মহত্যা করবো। আমি আত্মহত্যা করবো......আকুলভাবে কাঁদতে থাকে তরুণীটি।

হাসান সান্ত্বনার স্বরে বললো—কেঁদোনা বোন। আত্মহত্যা তোমার করতে হবে না। তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেবো না আমরা।

আমার বাবা ব্রাহ্মণ। আপনি জানেন না হিন্দু জাতীর মধ্যে ব্রাহ্মণদের কন্যাদায় কত কঠিন। আর আমার এই কলঙ্কময় জীবন...

বুঝেছি। গম্ভীর কণ্ঠে বললো হাসান। মাথা নিচু করে কিছু ভাবলো তারপর বললো—তোমার এ অবস্থার পূর্বে কি করতে বা কোথায় ছিলে যদি কোন আপত্তি না থাকে বলবে? হাঁ তার পূর্বে তোমার নামটা জানতে চাই?

আমার নাম সাবিত্রী। বাবা প্রফেসার ছিলেন এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। আমরা পাঁচ বোন তিন ভাই। বাবার পেনশানের সামান্য টাকায় সংসার চালানো কঠিন। তারপর আমরা তিন বোন বিবাহ যোগ্যা। আমি বি, এ পাশ করে বাবার দায়িত্বভার কমানের জন্য কোন এক স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতাম। সংসার খরচ চালিয়ে কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করে রাখতাম বাবাকে কন্যাদায়ে সাহায্য করবো বলে। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে আমিও চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে আসি। সংসারে ভীষণ অভাব অভিযোগ দেখা দেয়। এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াই কিন্তু পেটের তাগিদে আবার আমাকে কাজে যোগ দিতে হয়। স্কুল করছি এমন এক দিনে একজন মেজর আর কয়েকজন খান সেনা সেই স্কুলে গিয়ে হাজির। মেজর আমাকে দেখেই কেমন যেন কুৎসিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তারপর স্কুলের হেড মাষ্টারকে বললো; আমাকে তার বাংলোয় পাঠিয়ে দিতে। আমি উর্দু না জানলেও বুঝতে পারলাম মেজরের কথাগুলো। মাষ্টার যদি তার কথা না শোনেন তবে তাকে হত্যা করা হবে এবং স্কুলটি ধ্বংস করে ফেলা হবে বলে ভয় দেখলো। থামলো সাবিত্রী।

ক্যাপটেন হাসান চোখ তুলে তাকালো সাবিত্রীর মুখের দিকে।

সাবিত্রীর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে, বললো কে—আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, না আমাকে তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। আমি তৎক্ষণাৎ স্কুল কক্ষ ত্যাগ করতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না কয়েকজন খান সেনা আমার সম্মুখে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। আমি দিশে হারার মত বৃদ্ধা মাষ্টারের পিছনে এসে লুকোলাম। এবার মেজর এসে আমার হাত ধরে ফেললো। আমি মেজরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তা ধস্তি শুরু করলাম। সেই সময় বৃদ্ধ-মাষ্টার আমাকে রক্ষা করার জন্য মেজরের হাত থেকে আমার হাত খানাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। মেজর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, সে খান সেনাদের ইংগিৎ করতেই খান সেনারা তাঁর দেহটাকে বেয়োনটের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললো। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য......সাবিত্রীর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেলো, সে যেন এই মুহূর্তে সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

হাসান মনোযোগ দিয়ে শুনছে। বললো—তারপর?

সাবিত্রী আবার বলতে শুরু করলো—বৃদ্ধ-মাষ্টারের অবস্থা দেখে অন্যান্য কোন মাষ্টার বা কোন ছাত্রী সে কক্ষে প্রবেশ করতে সাহসী হলো না। আমি তখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য পথ খুঁজছি। যেমন পিছন দরজার দিকে এগুতে গেলাম অমনি মেজর আমাকে ধরে ফেললো। একচুল আমি নড়তে পারলামনা, আমাকে টেনে তাদের গাড়িতে তুলে নিলো। তারপর একটা বাংলোর সামনে এসে গাড়ি থামলো। মেজর আমাকে টেনে নামিয়ে নিলো। সেই বাংলোর মধ্যে নিয়ে আমাকে......তারপর আরও কি আপনি শুনতে চান?

হাসান করুণ ব্যাথা ভরা চোখে সাবিত্রীর কোমল অসহায় মুখ খানার দিকে তাকালো।

সাবিত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হাসান এবার উঠে দাঁড়ালো, আপন মনে পায়চারী করতে লাগলো সে। কিছুক্ষণ পর ডাকলো—রুস্তম।

রুস্তম তাঁবুতে প্রবেশ করে বললো—আমাকে ডাকছ হাসান ভাই।

হাঁ! সমীর ক্যাম্পে আছে?

আছে।

আচ্ছা রুস্তম সমীর ব্রাহ্মণের ছেলে বলে শুনেছিলাম?

হাঁ সমীর ব্রাহ্মণ।

ওকে ডেকে আনো।

রুস্তম বেরিয়ে যায় একটু পরে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সমীর সহ পুনঃ প্রবেশ করে। দ্বীপ্ত উজ্জল মুখ, বলিষ্ঠ প্রসস্ত চেহারা। দাঁড়ালো রুস্তম আর সমীর হাসানের সম্মুখে। হঠাৎ অসময়ে এ তাঁবুতে কোনো তাদের ডাকা হলো জানেনা ওরা।

হাসান সমীরের পা থেকে মাথা অবধি তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—সমীর।

বলো হাসান ভাই?

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি যুদ্ধ করেছিলে?

হাঁ করেছিলাম। মনে মনে ভাবে হাসান তো সবই জানে তবু কেনো তাকে এ প্রশ্ন করছে। নীরবে জবাব দেয় সমীর।

হাসান বললো—তুমি বাংলার স্বাধীনতায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলে? অনেক ত্যাগ তুমি দিয়েছো যদি বলি আরো ত্যাগ তোমাকে দিতে হবে পারবে না?

শান্ত কণ্ঠে বললো সমীর—পারবো।

হাসান এবার সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো—একে তোমার বিয়ে করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সমীর ওর দিকে তাকালো, মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে।

হাসান এগিয়ে এসে সমীরের পিঠে হাত রেখে বললো—সমীর নতুন করে তোমাকে কিছু বলতে হবে না তুমি সব জানো। খান সেনাদের দ্বারা সাবিত্রী নির্যাতীতা এমন কি মা হতে চলেছে। এর বাবা গরিব ব্রাহ্মণ প্রফেসার, অনেকগুলো বিবাহ যোগ্যা বোন ঘরে আছে। কাজেই সে ঘরে ফিরে যেতে পারে না, তার জন্য তার বাপ মা ছোট বিবাহ যোগ্যা বোনদের ভবিষ্যত নষ্ট করতে পারেন না। তাই ওর একমাত্র পথ আত্মহত্যা করা। সমীর তুমি কি চাও একটি জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়? বলো?

না আমি তা চাই না।

তবে পারবে ওকে গ্রহণ করতে?

সমীর নীরব।

সাবিত্রী একবার অসহায় করুণ চোখে তাকালো সমীরের সুন্দর দীপ্ত মুখের দিকে। সমীরের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার।

সাবিত্রী দৃষ্টি নত করে নিলো।

হাসান বললো—মনে করো স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন তুমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলে, তেমনি আজ তুমি সাবিত্রীর মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দাও।

হাসান ভাই আপনার কথা আমি মেনে নিলাম, সমীর শান্ত কণ্ঠে বললো।

হাসান এবার সাবিত্রীর হাত খানা তুলে নিয়ে সমীরের পাশে দাঁড় করিয়ে ওর হাত খানা সমীরের হাতের উপর রেখে বললো—জানি সাবিত্রী তোমাকে পেয়ে সুখী হবে তুমি একে যত্নে রেখো ভাই।

সমীর আর সাবিত্রী নত হয়ে ক্যাপটেন হাসানের পদধূলি গ্রহণ করলো।

হাসান এক সময় সমীরকে বলেদেয় একে বাড়ি নিয়ে যাবার পূর্বে হলুদখালি হসপিটালে নিয়ে যাও। সেখানে বাংলাদেশ সরকার নির্যাতীতা মহিলাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছেন। একে ভর্তি করে দাও হসপিটালে।

সমীর মাথা নত করে সম্মতি জানায়।

❑

একা একা তাবুতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলো হাসান। মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা কোন এক জায়গায় ফাংশানে গেছে! হাসান শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো গত দিনের

কথা! সাবিত্রী আর সমীরের কথা। সমীরের মত সব ছেলে যদি এই সব অসহায় তরুণীদের বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতো তাহলে ঐ সব বিপন্না নারীরা হয়তো বেঁচে থাকার একটা পথ পেতো। কত নারী আজ খান সেনাদের দ্বারা নির্যাতীতা—তারা সমাজে স্থান না পেয়ে সব আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে! মরণ ছাড়া তাদের যেন কোন গতি নাই। ......কত কি ভাবছে হাসান এমন সময় তাবুতে প্রবেশ করে শামীমা। মুখমণ্ডল করুণ ব্যথাভরা! চোখ দুটো ছল ছল করছে।

হাসান পদ শব্দে চোখ তুলে তাকায়—আরে শামীম তুমি।

শামীমা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো কোন জবাব সে দিলো না।

হাসান বিছানায় উঠে বসে বললো—বসো।

শামীমা তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

হাসান বললো—কি হয়েছে শামীমা? এ ক'দিন আসোনি কেনো? কই জবাব দাও? একি কাঁদছো? কি হয়েছে বলো? হাসান শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। চিবুকটা তুলে ধরে—একি তোমার কপালে ক্ষত চিহ্ন কেনো?

এবার শামীমা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠে—আমার ভাবী আমাকে মেরেছিলো। আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেবেনা। কড়া পাহারা রেখেছে যেন বেরুতে না পারি।

তাতে কি, ভাবী যদি বেরুতে না দেয় তাহলে এসোনা।

হাসান ভাই আপনিও আমাকে চাননা?

না—না সে কথা বলছিনা শামীমা। তুমি এলে তার যদি কোন অসুবিধা হয় তাই বলছিলাম।

অসুবিধা আমি বাড়িতে না থাকলে তার নির্যাতন চলেনা।

আমাকে যন্ত্রনা দেওয়াই হলো তার কাজ এবং এতেই তার শান্তি।

ও বুঝেছি। যেমন তোমার ভাই ছিলো নর-পিশাচ তেমনি তোমার ভাবীও নর-পিশাচী।

শামীমা চুপ করে থাকে।

হাসান বলে—বসো। ওর হাত ধরে বসিয়ে দেয় হাসান। নিজেও বসে ওর পাশে।

শামীম বলে—হাসান ভাই এ পৃথিবীতে আমাকে স্নেহ আদর করবার কেউ নেই। চিরদিন আমি ভাই ভাবীর কাছে লাঞ্ছনা পেয়ে এসেছি। আমি চাই কাজের মধ্যে নিজকে বিলিয়ে দিতে। পরের উপকার করতে পারলে আমার মনে সান্ত্বনা খুঁজে পাই। কিন্তু ভাবী আমার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাসান একটু শব্দ করলো—হুঁ, তাহলে তোমার ভাবীকে শায়েস্তা করতে হয়।

না—না ভাবীর কোন অমঙ্গল আমি চাইনা। ভাবীর কোন অমঙ্গল আমি চাইনা হাসান ভাই। ভাবী ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই......

হাসলো হাসান, বললো—বেশ তুমি যা চাও তাই হবে।

এমন সময় খলিল নামক এক মুক্তিযোদ্ধা তরুণ ও আরও কয়েকজন সেই তাঁবুতে প্রবেশ করে। তাদের মুখমন্ডলে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন হাসান বললো—হিজলা জঙ্গলে কোন এক পোড়া বাড়ির মধ্যে খান সেনা আত্মগোপন করে আছে সংবাদ পাওয়া গেছে। হাসান ভাই আপনি শীঘ্র চলুন হিজলা যেতে হবে।

এ সংবাদ তোমরা কি করে জানতে পারলে খলিল?

আমাদের বাড়ি হিজলা জঙ্গলের অদূরে পলাশপুর গ্রামে! পলাশপুরের কোন এক রাখাল হিজলা জঙ্গলে গিয়েছিলো গরু খুঁজতে। কয়েকজন খান মিলিটারী নাকি তাকে ডেকে কিছু টাকা দেয় এবং কিছু খাবার জিনিস কিনে দিয়ে যেতে বলে। সেই রাখাল ছেলে আমাকে সংবাদটা জানিয়েছে।

ক্যাপ্টেন হাসান বললো—তাহলে তো বিলম্ব করা উচিৎ নয়। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

শামীমা বলে উঠে—আজ আমিও যাবো হাসান ভাই।

তা হয় না তুমি ছেলে মানুষ......

আমি ছেলে মানুষ নই আমাকে আজ সঙ্গে নিতেই হবে।

বেশ যাও তৈরি হয়ে নাওগে।

শামীমা বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই তৈরি হয়ে নেয়। প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটা রাইফেল।

সমীরও এসেছে সে ও আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এদের সঙ্গে রয়েছে রিভলভার।

শামীমা পুরুষের বেশে সেও অন্যান্যদের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে তার দীপ্ত কঠিনভাব, নারী হলেও সে কোন কাজে পিছপা হবেনা। শামীমার চুলগুলো পুরুষের চুলের মত খুব ছোট না হলেও লম্বা নয় এবং সে কারণেই তাকে মাথায় কিছু বাঁধতে হয় না। লম্বা সুঠাম চেহারা, পুরুষের পোশাকে সুন্দর মানায় ওকে। সেই কারণেই আজও কোন ছেলে তাকে মেয়ে বলে ধরতে পারেনি।

হাসান নিজেও পোশাক পরে সজ্জিত হয়ে নিয়েছে।

অল্পক্ষণেই তারা হিজল জঙ্গলের উদেশ্যে রওয়ানা দিলো। সেই রাখাল ছেলেটি অবশ্য তাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে চললো, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তারা পৌঁছলো হিজল জঙ্গলের অদূরে।

এবার হাসান সবাইকে বলে নিলো—ভাইরা তোমরা সব সময় সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হবে। হঠাৎ যদি খান হানাদার বাহিনী টের পায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য।

ক্যাপটেন হাসানের কথামত সবাই অস্ত্র হাতে অতি সাবধানে এগুতে লাগলো। সকলের আগে রয়েছে হাসান। তার পিছনে এবং আশে-পাশে অন্যান্য সবাই। শামীমা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য হাসানের পাশ থেকে দূরে সরে যায়নি। তার লক্ষ্য হল হাসান। শত্রু সেনারা যেন হাসানের উপর গুলি ছুঁড়তে না পারে এটাই তার ইচ্ছা।

চলার ফাঁকে একবার বললো হাসান—শামীম তুমি পিছনে যাও।

না আমি আপনার কাছে কাছে থাকবো।

বেশ যা খুশি করো।

কিছুক্ষণ চলার পর তারা পোড়ো বাড়িটা দেখতে পেলো। রাখাল ছেলেটা এখনও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তার মুখে এতোটুকু ভয়ের চিহ্ন নাই। হাসান ওকে নিজের পাশে পাশে রেখেছে। ছোট্ট ছেলে তবু তার চোখে মুখে কর্তব্যের ছাপ। চলতে চলতে বললো রাখাল ছেলেটা—ওরা আমার বাপ জানকে মেরেছিলো আমি আমি ওদের মারবো। তুমি আমাকে একটা অস্ত্র দাও ক্যাপ্টেন।

রাখাল ছেলেটা শুনেছিলো, হাসান মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা বা ক্যাপ্টেন—তাই সে হাসানের কাছে অস্ত্র চেয়ে বসলো।

হাসান হেসে বললো—তুমি ছোট ছেলে কাজেই এসব অস্ত্র চালাতে পারবে না। তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আমরাই ওদের খতম করবো।

আরো কিছু চলার পর রাখাল ছেলেটা বলে উঠলো—ঐ যে সেই পোড়া বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ঐ বাড়িটার মধ্যে লুকিয়ে আছে খান সেনারা।

রাখাল ছেলেটার কথা শেষ হয় না একটা গুলি সা করে চলে যায় তাদের কানের পাশ কেটে।

হাসান সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে। নিজেও উঁচু হয়ে শুয়ে পড়ে হাসান।

ওরা শুয়ে পড়ার পরপরই আরো কয়েকটা গুলি চলে গেল তাদের উপর দিয়ে।

হাসান বললো—তোমরা সবাই বুকে ভর করে এগুতে থাকো। খান হানাদারগণ টের পেয়ে গেছে কাজেই তারা অবিরাম গুলি চালাবে। খবরদার কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবে না।

হাসানের কথামত মুক্তিযোদ্ধা তরুণ দল বুকে ভর করে রাইফেল প্রস্তুত রেখে এগুতে থাকে।

তবু গুলি আসছে।

হাসান বললো—তোমরা বনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ো। লক্ষ্য রাখবে বাঁশীর শব্দ শোনা মাত্র সবাই একত্রিত হবে।

এবার মুক্তিযোদ্ধা তরুণ দল বুকে ভর দিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই এগুছে।

ওদিক থেকে গুলি—গোলা আসছে।

এবার হাসান নিজে ফাঁকা আওয়াজ করলো, একটি দু'টি তিনটি।

হাসান কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেছে। সেখান থেকে সে অবিরত গুলি ছুঁড়ছে।

খান সেনারা পাল্টা জবাব দিচ্ছে। তবে হাসান একটি গুলি ছুড়লে খান সেনাদের তরফ থেকে দশটা গুলি আসছে। অনেক এগিয়ে এসেছে হাসান।

অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দলও জঙ্গলে আত্মগোপন করে পোড়ে। বাড়ি খানার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে।

হঠাৎ গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

পোড়ো বাড়ির দিকটা সম্পূর্ণ নীরব মনে হচ্ছে।

হাসান প্রায় এসে গেছে বাড়িটার কাছাকাছি। মাঝে মাঝে সে গুলি ছুড়ছে। কিন্তু কোন জবাব আসছে না ওদিক থেকে। ততক্ষণে তার দল-বল সবাই এসে হাজির হয় তার আশে-পাশে।

হাসান এদের লক্ষ্য করে বলে—ওরা নিশ্চয়ই কোন মতলব এঁটেছে, দেখছোনা আর গুলি ছুঁড়ছে না।

সমীর বললো—হয়তো ওদের গুলি শেষ হয়ে গেছে।

খালেদ বললো—আমার মনে হচ্ছে ওরা পালিয়েছে।

হাসান বললো—তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে আসতে পারো, আমি এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবো।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলে উঠলো—আমরা সবাই যাবো।

হাসান বললো—তা হয়না যে কেউ একজন আমার সঙ্গে আসবে, হয়তো সে আর নাও ফিরে আসতে পারে। তোমরা সবাই অস্ত্র নিয়ে পোড়ো বাড়িটার চার পাশ ঘিরে রাখবে কেউ যেন পালাতে না পারে। হাসান উদ্যত

রিভলভার হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়। পিছনে এগিয়ে আসে হীরা। তার হাতে রাইফেল।

দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে যায় মৃত্যুর গুহার মধ্যে।

বিপুল উন্মাদনা নিয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে হাসানের দলবল।

পোড়ো বাড়িটার প্রত্যেকটা ভাঙ্গা-চূরা বসে পড়া ঘর তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালায় হাসান আর হীরা কিন্তু কোথাও বর্বর খান হানাদারদের সন্ধান পায় না। তবে ওরা খান হানাদারদের অনেক অস্তিত্ব সেখানে দেখতে পায়, যার দরুণ বুঝতে পারে ওরা একটু আগেও এখানে ছিলো। সিগারেটের বাক্স, পোড়া অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট। বিস্কুটের খালি প্যাকেট, মাখনের টিন এমনকি অনেক কিছু নজরে পড়তে লাগলো।

কিন্তু গেলো কোথায় ওরা।

হাসান আগে পিছনে হীরা।

অতি সতর্কতার সহিত এগুচ্ছে তারা।

বাইরে হাসানের সঙ্গীরা ক্রমেই বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তারা ব্যকুল মনোভাব নিয়ে অস্ত্র হাতে প্রতিক্ষা করছে।

হাসান সম্মুখে একটা বন্ধ দরজা দেখতে পেলো। হীরা চাপা কণ্ঠে বললো—নিশ্চয়ই এই কক্ষে কেউ আছে।

হাসান বললো—সেইরকম আমারও মনে হচ্ছে।

কথা শেষ করেই প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় হাসান সেই বন্ধ দরজায়। এক বার দুই বার তিন বার।

দরজা ভেঙ্গে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে হাসান আর হীরা দেখলো কতকগুলো নারীর উলঙ্গ রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে মেঝেতে। এই মাত্র তাদের হত্যা করা হয়েছে।

হাসান একদণ্ড ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো তারপর ওদিকের আর একটি দরজা লক্ষ্য করে দ্রুত এগুলো হীরাও তাকে অনুসরণ করলো।

ওদিকের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো। একটা পথ দেখা গেলো সোজা সামনের দিকে। পথটা সুড়ঙ্গ পথ বটে, হাসান আর হীরা এই পথে অগ্রসর হলো যদিও তারা জানে তাদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

হাসান আর হীরা যতই এগুচ্ছে ততই পথটা প্রশস্ত বলে মনে হচ্ছে। হাসান সম্মুখে, তার হাতে উদ্যত রিভলভার। আরও কিছুদূর এগুতেই দেখলো একটা বিরাট কক্ষ, কক্ষ মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন খান হানাদার আত্মগোপন করে বসে আছে।

হাসান আর হীরা রিভলভার উদ্যত করে দাঁড়ালো।

হাসান কঠিন কণ্ঠে বললো—একচুল কেউ নড়বেনা।

কিন্তু একজন খান হানাদার রাইফেল উঁচু করে সঙ্গে সঙ্গে হাসানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

হাসান চট্‌ করে সরে দাঁড়ায়।

গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হলো দেয়ালে।

হীরার গুলি ততক্ষণে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে সেই খান সেনাটির বুকে। একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো খান সেনাটি।

শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

এতোগুলো খান সেনার সঙ্গে হাসান আর হীরার—তুমুল যুদ্ধ চলেছে। খান সেনাদের কাছে তখন প্রচুর গুলি ছিলোনা। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো হাসান আর হীরার কাছে।

ওরা যখন হাসানের পায়ের কাছে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র রাখছিলো তখন হাসানের দলবল এসে হাজির হয় সেখানে। তারা গোলাগুলি শব্দে পোড়াবাড়িটার ভিতরে প্রবেশ করে এবং অগ্রসর হতে হতে শেষ অবধি সেই কক্ষে এসে হাজির হলো।

হাসান এদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে ফেলতে আদেশ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা খান হানাদারদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো।

খান সেনারা ভিজে বিড়ালের মত একেবারে চুপসে গেছে। সবাইকে বেধে নিয়ে পোড়াবাড়ির বাহিরে এসে দাঁড়ালো হাসান আর তার দলবল।

চারিদিকে জঙ্গল, কোথাও এতোটুকু ফাঁকা জায়গা নজরে পড়লোনা। সবাই মিলে খান সেনাদের ঘিরে রেখেছে।

হাসান বললো—এইসব বর্বর খান হানাদারদের বন্দী করে শহরে নিয়ে যাবোনা। এরা যে অপরাধ করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি নিজ হাতে দেবো। এরা একটু পূর্বেই কতকগুলো অসহায় নারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ক্ষমা আমি কিছুতেই করবোনা। সমীর হীরা তোমরা এদের পায়ে দড়ি বেঁধে গাছের সঙ্গে লটকে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন হাসানের আদেশ পালন করলো ওরা। খান হানাদার বাহিনীর পায়ে দড়ি বেঁধে জঙ্গলের একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

বললো হাসান—তোমরা যথেষ্ট পাপ করেছিলো। হত্যা করেছো বাংলার অসংখ্য মানুষ। কত শত শত ঘর বাড়ি তোমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছো তবু আমি তোমাদের ক্ষমা করতাম, বন্দী করে নিয়ে তুলে দিতাম পুলিশের হাতে বিচারে যা হয় তাই হতো কিন্তু তোমরা এই কিছু সময় পূর্বে কতকগুলো মা বোনের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছো। তাদের ইজ্জৎ লুটে নেবার পরও তোমরা তাদের রেহাই দাও নাই—হাসান দাঁতে

দাঁত পিষে কথাগুলো বললো। তারপর—রিভলভার উঁচু করে ধরলো এক এক গুলিতে এক একটি খান সেনার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলো।

সবাইকে শেষ করে হাসান হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ বাংলার সর্বনাশ করে তোমরা রেহাই পাবেনা শয়তানের দল। তোমাদের পরিণতি মস্তকহীন দেহগুলো গাছের ডালে ডালে ঝুলবে। শিয়াল কুকুর তোমাদের দেহের মাংস খেতে পারেনা। তোমাদের দেহের মাংস পঁচে খসে খসে পড়বে নিচে তখন তারা খাবে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ......

হাসানকে তার দলবল এভাবে হাসতে দেখে অবাক হয়ে যায়। তারা কোনদিন দেখেনি হাসানের এই রুদ্র মূর্তি। দেখেনি তার এমন অদ্ভুত ধরণের হাসি। সবাই ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়, কাজ তাদের শেষ হয়েছে।

হঠাৎ হাসান বলে উঠে—ওকে তো দেখছিনা।

শামীম কিন্তু এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে হাসানের কার্য কলাপ লক্ষ্য করছিলো। দেখছিলো সে হাসানের এক নতুন রূপ। হাসানের সামনে শামীম বলে উঠে—তাইতো রাখাল ছেলেটি কোথায়?

সবার খেয়াল হলো?

এতোক্ষণ খান হানাদারদের সঙ্গে লড়াই নিয়ে ওর কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলো সবাই। এবার সকলে মিলে রাখাল ছেলেটির সন্ধানে লেগে গেলো।

হঠাৎ সমীর বলে উঠলো—এইতো এখানে এটী কে পড়ে আছে?

সবাই এগিয়ে গিয়ে দেখলো রাখালের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে শুকনো পাতার মধ্যে। খান হানাদারদের গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে তার কচি বুকের এক পাশে! কখন যে সে পড়ে গিয়েছিলো কেউ জানেনা।

রাখাল বালকটার শিয়রে এসে দাঁড়ালো হাসান। তার সঙ্গীরা অবাক হয়ে দেখলো ক্যাপ্টেন হাসান রুমালে চোখ মুছে। অবাক হলো তারা যে হাসান একটু পূর্বে কঠিন এক মানুষ ছিলো। যে তার রিভলভারের গুলিতে একটু পূর্বে খান সেনা বাহিনীদের লোকগুলোকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করলো সেই হাসান একটা রাখাল ছেলের জন্য অস্ত্র বিসর্জন করছে আশ্চর্য হবার কথা বটে।

বললো হাসান—যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো, সেই অসীম সাহসী আত্মত্যাগী বীর বালক আর ফিরে যেতে পারলোনা আমাদের সঙ্গে। সত্যি বড় দুঃখ বড় বেদনার কথা। আমার বন্ধুগণ তোমরা এই রাখাল

বালকের মৃত দেহ তার মায়ের কাছে পৌছে দেবে এবং তার দুঃখ ব্যথা দূর করতে চেষ্টা করবে।

হাসানের কথায় তার সঙ্গীরা রাখাল বালকের রক্তাক্ত দেহটা তুলে নিলো কাঁধে।

❑

আজও শামীমা যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন ভাবী কুলসুম ভীষণ মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে এলো। শামীমার চুলগুলো এনে ধরে টেনে নিয়ে চললো—হারাম জাদী ফের তুই বাইরে গিয়েছিলি! আজ তোকে খতম করবো......

কুলসুমের কথা শেষ হয়না জমকালো একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় তাদের সম্মুখে। হাতে তার উদ্যত সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

কুলসুম সঙ্গে সঙ্গে শামীমার চুল ছেড়ে দেয়। ভয় বিস্ময় নিয়ে তাকায় জমকালো মূর্তিটার দিকে। ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বলে—কে কে তুমি বাবা? কি চাও আমার কাছে?

জমকালো পোশাক পরা লোকটা বলে উঠে—আমি আজরাইল।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো কুলসুম—আজরাইল।

হাঁ তোমার জান নিতে এসেছি। সুতীক্ষ্ণ ধার ছুরিখানা উঁচু করে ধরলো জমকালো মূর্তি কুলসুমের বুকের কাছে।

শামীমাও ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেছে। সে ভয়াতুর চোখে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তিটার দিকে।

কুলসুম হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো—আমাকে মেরোনা তুমি যা চাও তাই পাবে। বলো বাবা কি চাও?

এবার জমকালো মূর্তি বললো—তুমি বাঁচতে চাও।

হাঁ আমি বাঁচতে চাই।

তবে আর কোনদিন এর উপর অত্যাচার করোনা। নিজের সন্তানদের মত একে ভালবাসবে......

হাঁ—হাঁ তাই বাসবো। আমি শপথ করছি আর কোনদিন ওর উপর অত্যাচার করবো না।

বেশ। আজ তাহলে তোমাকে রেহাই দিলাম। কথা শেষ হতে না হতেই বেরিয়ে যায় জমকালো মূর্তি।

কিং কর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে শামীমা।

কুলসুম একেবারে পাথরের মূর্তি বনে গেছে।

এরপর থেকে কুলসুম সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ বনে গেলো। শামীমাকে সে নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি আদর যত্ন করতে শুরু করলো।

শামীমা ঘুম থেকে উঠতেই তার হাত মুখ ধোয়ার পানি এনে সামনে রাখে কুলসুম। তারপর নাস্তার সময় নাস্তা ভাত খাবার সময় ভাত তরকারী সব না চাইতেই সামনে হাজির। এমন কি গোসলের পানিটাও কুলসুম তুলে দেয় কুয়া থেকে।

শামীমা একেবারে বিব্রত হয়ে পড়ে যে বলে থাক থাক আমিই পানি উঠিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু কে শোনে তার কথা কুলসুম তার কাজ করে চলেছে। সদা ভয় শামীমের প্রতি একটু অযত্ন হলেই সেই জমকালো আজরাইল এসে তার জান বের করে নেবে। সব সময় কুলসুমের চোখের সামনে ভাসে আজরাইলের হাতের সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা খানা। তাই সে কুকড়ে থাকে অপরাধীর মত।

এখন শামীমা প্রায়ই আসে হলুদ খালি ঘাটিতে। তার কোন অসুবিধা হয় না বা বাধা পায় না।

একদিন হাসান হেসে বলে শামীমা আজকাল তোমাকে সব সময় প্রসন্ন বলে মনে হয়। তোমার ভাবী বুঝি এখন তোমার কোন কাজে বাধা দেয় না?

শামীমা হেসে বললো—সত্যি আশ্চর্য ভাবে পাল্টে গেছে ভাবী।

কারণ?

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কদিন থেকে আপনাকে কথাটা বলবো বলবো করছি কিন্তু বলা হয়নি।

কি এমন ব্যাপার? বললো হাসান।

শামীমা এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই রাতের কাহিনীটা বর্ণনা করে শোনালো।

হাসান দু'চোখ কপালে তুলে বললো—সত্যি আমিও আশ্চর্য না হয়ে পারছিনা। কে সে জমকালো পোশাক পরা লোকটা। নিশ্চয়ই কোন দূষ্কৃতি হবে।

নানা সে দৃষ্কৃতি নয়। কোন মহৎ জন—

তবে অমন আত্মগোপন করে যাবে কেনো? সরাসরি গিয়ে তোমার ভাবীকে বলতে পারতো বা শাসন করে দিতে পারতো। যাক সে সব কথা, তোমার সব অসুবিধা দূর হয়েছে তো?

হাঁ। ভাবী আমাকে এখন খুব যত্ন করেন।

আচ্ছা শামীমা তা হলে তোমার এ পুরুষ ড্রেসের আর কোন প্রয়োজন নাই। সরাসরি এখানে হাজির হবে, এখানে সবাই তোমাকে বোনের মর্যাদা দেবে। হাঁ আজ কয়েকটা কথা বলবো তোমাকে।

বলুন হাসান ভাই।

শুধু তুমি নও তোমার মত আর বহু বোন আছে যারা দেশ গড়ার কাছে উৎসাহী। তুমি তাদের নিয়ে আসবে, আমি সবাইকে কাছে বলে দেবো। বাংলার নারী পুরুষ সকলেরই কর্তব্য আছে। শুধু পুরুষ কাজ করবে নারীরা পারবেনা এক হতে পারে না। নারী পুরুষ মিলে গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা।

শামীমা পরদিন বাড়িতে এসে ভাবীর কাছে সব খুলে বললো। ভাবী সব শুনে আনন্দে আত্মহারা হলো, বললো—স্বামী ভুল বুঝেছিলো বলে আমিও ভুল করতে পারিনা। স্বাধীন বাংলার আমিও একজন স্বাধীন মানুষ। আমার কি এতোটুকু কর্তব্য নাই? শামীমা আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিবি।

পরদিন গ্রামের মেয়েদের ডেকে শামীমা সবাইকে দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়ার জন্য অনুরোধ জানালো। যারা তার সঙ্গে যাবার জন্য আগ্রহ দেখালো শামীমা তাদের সঙ্গে নিয়ে গেলো হলুদ খালি ঘাটিতে।

হাসান শামীমা ও তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে হলুদ খালি ঘাটির মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো।

হাসান বললো এই যে বোনটিকে সম্মুখে দেখছো একে চিনতে পারছো তোমরা? নিশ্চয়ই পারছোনা কারণ একে তোমরা দেখোনি কোনদিন তাই না?

মুক্তিযোদ্ধা তরুণরা বললো—না।

কিন্তু আমি যদি বলি তোমরা একে বহুবার দেখেছো। এমনকি এর সঙ্গে এক হয়ে কাজও করেছো তোমরা।

সবাই অবাক হয়ে একবার হাসান ও একবার শামীমার মুখে তাকাতে লাগলো।

হাসান বললো—তোমরা শামীমকে চিনতে?

শামীম নামটা শুনতেই সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—হাঁ তাকে চিনি।

এই সেই শামীম। হাসানের মুখে মৃদু হাসির রেখা একটু থেমে বললো আবার—আমাদের সমাজ মেয়েদের চার দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। তাই শামীমা পুরুষের বেশে চার দেয়ালের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলো। যোগ দিয়েছিলো সে দেশ গড়ার কাজে। যতটুকু পেরেছে সে অন্তর দিয়ে সাহায্য করেছে। তোমরা জানো মসিপুর সাঁকো মেরামত কালে সেও ছিলো তোমাদের পাশে। শিবপুর বিধ্বস্ত গ্রামে আবার ঘর বাড়ি তৈরি করা কালে শামীম তোমাদের অনেক সাহায্য করেছে। হাতীমারী খান সেনাবাহিনী এবং অবাঙ্গালীদের পাকড়াও কালে সে আমাদের সঙ্গী হবার জন্য যথেষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো কিন্তু আমি তাকে ক্ষান্ত করেছিলাম। এর পরের সংগ্রামে হিজলা জঙ্গলে সে আমাদেরই পাশে ছিলো কাজেই শামীমের সব কিছু তোমরা জানো।

হাঁ আমরা তাকে ভাল ভাবে জানি।

কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জানতে না। শামীম নারী পুরুষ নয়। তোমরা এবার বুঝতেই পারছো পুরুষদের মতই নারীদের কর্তব্য আছে এবং করবার ক্ষমতাও আছে। তাদের বাদ দেওয়া যায়না। আজ শামীমার সঙ্গে যে সব বোনেরা এসেছেন এরা সবাই তোমাদের সঙ্গে মিশে দেশ গড়ার কাজ করতে চান।

মুক্তি যোদ্ধা ছেলেরা বলে উঠে—আমরা খুশি মনে আমার বোনদের সহায়তা গ্রহণ করবো। আমরা তাদের সমান অধিকার দেবো আমাদের পাশে।

এবার হলুদ খালি ঘাটিতে নারী পুরুষ মিলে কাজ চললো। যখন যে গ্রামে প্রয়োজন মনে করলো সেখানেই তারা হাজির হলো। পুরুষদের কাজ পুরুষরা করতো আর মেয়েদের সহায়তায় মেয়েরা এগিয়ে যেতো। যে সব মহিলা বা তরুণী খান সেনাবাহিনী দ্বারা নির্যাতীত তাদের শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা এবং পুনঃর্বাসনের ব্যবস্থা করতো।

হলুদ খালি এবং হলুদ খালির আশে পাশে কয়েকটা গ্রাম এবং বন্দর আদর্শ গ্রাম হয়ে গড়ে উঠলো। এ কয়টি গ্রামের প্রত্যেকটা তরুণ এসে যোগ দিয়েছে ক্যাপটেন হাসানের দলে? শুধু তরুণ দলই নয় বৃদ্ধ যুবক বয়স্ক সবাই এসে হাজির হয় কাজের সময়। অবশ্য নিজেদের জমিতে কাজ শেষ করেই আসে তারা।

হাসান বলেছে—আমার কৃষক ভাইরা, তোমরা নিজেদের জমিতে ফসল ফলাও। নিজেদের বাড়ি ঘর মেরামত কর তার পরদিনে একবার দু'ঘন্টা সময় দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করো।

চাষীগণ হাসানের কথা ফেলতে পারেনি তারা জমিতে চাষ করে বাড়ি-ঘর মেরামত করে যখন অবসর পায় তখন এসে হাজির হয় এক জায়গায়। হাসান এদের উপর কাজের দায়িত্ব তুলে দেয়। অবশ্য নিজেও থাকে তাদের সঙ্গে। গ্রামের যে পথঘাট নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো হাসান এদের নিয়ে আবার নূতন করে পথ ঘাট তৈরি করে। পথের দু'ধারে চারাগাছ লাগিয়ে দেয়। পথিকদের ছায়াদান করবে বলে।

এমনি দেশ-গড়ার অনেক কাজ করে ওরা।

হাসান বলে—আমার বন্ধুগণ তোমরা তোমাদের নিজের দেশকে সুন্দর করে গড়ে নিচ্ছো। তোমাদের সুখ-সুবিধার জন্য এসব করছো কাজেই এসব কাজ তোমাদের নিজের কাজ। তোমরা কারো কাছে এর জন্য পয়সা দাবী করোনা। পয়সা তোমাদের কে দেবে। স্বাধীন বাংলার সরকার তো বাংলার মানুষ। তোমরাই দোষী, তোমরাই বিচারক। বঙ্গবন্ধু বলেছেন তোমরা সোনার বাংলাকে সোনার সোহাকময় ভরে তোল, তোমরাই তার ফল ভোগ করবে।

একদিন হাসান যখন বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন হামিদ এসে চুপি চুপি বললো—হাসান ভাই এক ডাকাত দলের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা মুক্তিযোদ্ধার বেশে হানা দিয়ে ডাকাতি করেছে।

বলোকি হামিদ?

হাঁ হাসান ভাই।

কি করে তোমরা এ সংবাদ পেলে?

একটা বৃদ্ধ প্রবেশ করে তাঁবুর মধ্যে—আমার কাছেই হামিদ সংবাদ পেয়েছে। এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন হাসান সাহেব।

একখানা চিঠি বৃদ্ধ হাসানের হাতে দেয়।

হাসান চিঠিখানা খুলে মেলে ধরে চোখের সামনে। চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করে বলে—চিঠিখানা আমার কাছে থাক।

বেশ আপনি রাখুন কিন্তু......

কোন কিন্তু নয় আপনি বাড়ি ফিরে যান।

বাড়ি ফিরে যাবো।

হাঁ।

আজ রাতে তারা যখন আমার বাড়িতে হানা দিয়ে বিশ হাজার টাকা চেয়ে বসবে তখন......

সে চিন্তা আপনাকে করতে হবেনা। আপনি যান এবং নিশ্চিন্তে ঘুমান গে।

এ আপনি কি বলছেন? মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের আপনি চেনেন না।

হেসে বললো হাসান—কে বললো এরা মুক্তি বাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা ছেলে?

ঐ যে চিঠিতে লেখা আছে' আমরা একদল মুক্তিযোদ্ধা আজ রাত দু'টোয় আপনার বাড়িতে যাবো, বিশ হাজার টাকা মজবুত রাখবেন। পুলিশে জানালে বিপদ আছে এমন কি মৃত্যু......

অট্টহাসি হেসে উঠলো হাসান—মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা ডাকাত ও একথা আপনি ভাবতে পারেন। বাংলার দামাল ছেলে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বাংলা জননীকে শত্রুমুক্ত করেছে। যারা প্রাণ দিতে এতটুকু ভয় পায়নি। যারা অকাতরে হাসি মুখে রক্ত দিয়েছে তারা ডাকাত। এ কথা ভাবা পাপ। কারণ মুক্তিযোদ্ধা বীরগণ আমাদের বাংলার গৌরব। তারা বাংলার অমূল্য সম্পদ কৃতী সন্তান। নানা আমি কোনদিন বিশ্বাস করিনা মুক্তিযোদ্ধারা এমন অসৎ কাজ করতে পারে! আপনি যান সত্যিই যদি তারা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে মুক্তি যোদ্ধাগণ হয় তবে তারা কোন সময় অসৎ কাজ করতে যাবে না। তাদের বিবেক আছে।

বৃদ্ধ মাথা নত করে বেরিয়ে গেলো।

হামিদ বললো—লোকটাকে বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে হাসান ভাই।

তাতো দেখতেই পেলাম।

হামিদ বললো—শুধু আজ নয় প্রায়ই এখানে সেখানে এই রকম চুরি ডাকাতি লুটতরাজ চলছে। বঙ্গবন্ধুর আদেশ অনুযায়ী তারা অস্ত্র জমা না দিয়ে সেই সব অস্ত্র নিয়ে এ সব করছে।

হাসান বললো—হামিদ মুক্তি বাহিনী যুবকরা কোনদিন বঙ্গবন্ধুর আদেশ অমান্য করতে পারে না। তাঁর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষেছে যারা তারা কোনদিন অসৎ হতে পারে না। যারা এখন চুরি ডাকাতি লুটতরাজ করছে তারাও বাংলার ছেলে কিন্তু তারা একটা মোহগ্রস্তের মত

এখন দিশে হারা হয়ে পড়েছে। মনে করেছে অস্ত্র যখন হাতে আছে তখন যা খুশি তাই করা যায় তাই এ চুরি ডাকাতি চলেছে।

আমি ভাবছি কি করে এ সব বন্ধ করা যায়?

এদের আঘাত হেনে কাবু করা যাবে না, এদের কানে দিতে হবে মূল্য মন্ত্র। যে মন্ত্র দ্বারা বাংলার মানুষ একদিন পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শত্রু সেনাদের উপর। বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর মধুর বাণীই এদের সৎ পথে টেনে আনবে আর রক্ত ক্ষয় করে বাংলার শ্যামল মাটি সিক্ত করা উচিৎ নয়। হামিদ এই সব চোর ডাকাত যাদেরে বলছে তারা আমাদেরই ভাই তবে কেনো তারা আমাদের বুকে অস্ত্র চালাবে। তবে একটি কথা স্মরণ রেখো শোষকদের ক্ষমা করবোনা কেউ। সে যে রকমেরই শোষক হোকনা কেনো। চাকুরীজীবী বল ব্যবসায়ী বলো কিংবা বিচারক বা বিচারপতি বলো। বাংলার মানুষের হাতে রেহাই পাবেনা যদি তারা যেনে শুনে অন্যায় করে।

হাসানের প্রত্যেকটা কথা হামিদ মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলো।

হাসান বলে চলেছে—লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে এ বাংলা স্বাধীন হয়েছে। বাংলার প্রতিটি মানুষ চায় শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। কাজেই প্রত্যেকটা মানুষের খেয়াল রাখা দরকার তারা যেন কোন সময় অসৎ মন নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়ে। হাঁ অনেক কিছু বলে ফেললাম। হামিদ যাও তোমার কাজে যাও।

হামিদ তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

পরক্ষণেই তাঁবুতে প্রবেশ করে শামীমা। এতক্ষণ সে আড়ালে থেকে হাসানের সব কথা শুনেছিলো। কথাগুলো যেন তার অন্তর স্পর্শ করে যাচ্ছিলো হাসান যেন একটা অদ্ভুত মানুষ। শামীমা তাঁবুতে প্রবেশ করে স্থির নয়নে তাকায় হাসানের দিকে।

হাসান হেসে বলে—কি দেখছো শামীমা?

হাসান ভাই আপনার কথা গুলো সত্যাই সুন্দর। যত শুনি আরও শুনতে ইচ্ছা করে।

তাই নাকি?

হাঁ! সত্যি অপূর্ব।

শামীমা।

বলুন হাসান ভাই?

মানুষ বেঁচে থাকে কিসের মধ্যে, তার কাজের মধ্যে। কাজেই তোমরা আজ যাও। কাজ আমি ভাল বাসি......

একটু থেমে বললো—বিশাল বিশ্বে অসংখ্য
ভীড়ের মাঝে কে কার মনে রয়
শুধু বেঁচে থাকে তার কাজ
অনন্ত কালের স্বাক্ষর হয়ে
নাহি তার কোনো ক্ষয়।

শামীমা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হাস্যনের মুখের দিকে ।

হাসান পায়চারী করে চলে। গভীরভাবে কি যেন ভাবে সে। শামীমা বলে—হাসান ভাই একটা কথা বলবো?

হাসান দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়—বলো?

না থাক আজ নয়...বেরিয়ে যায় শামীমা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হাসান ওর চলে যাওয়া পথের দিকে। একটু হাসির রেখা ফুটে উঠে হাসানের ঠোঁটের ফাঁকে তারপর পকেট থেকে সেই চিঠিখানা বের করে ধরে চোখের সামনে।

❑

একদল মুক্তিযোদ্ধা বেশী ডাকাত প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। তাদের অধিনায়ক রুশদী বললো—অর্থ চাই আবারও অর্থ। অর্থের বিনিময়ে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

তার দলবল সবাই বলে উঠলো হাঁ আমরা অর্থের বিনিময়ে প্রাণ দিবো। সকলে দক্ষিণ হস্তে রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জমকালো পোশাক পরা অবস্থায় একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো। তার দু'হাতে দুটি রিভলভার। মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। আচমকা এই জমকালো মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে সবাই হক চকিয়ে গেলো।

জমকালো মূর্তি বললো—সবাই অস্ত্র ফেলে দাও। নইলে গুলি ছোড়বো।

রুশদীর দিকে তাকালো তার দলবল।

রুশদীর দুচোখ রক্তবর্ণ ধারন করেছে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তির হাতের আগ্নেয়অস্ত্র দুটির দিকে।

জমকালো মূর্তি পুনরায় কঠিন কণ্ঠে বললো, একচুল নড়বেনা। নড়লেই মৃত্যু—ফেলে দাও তোমার হাতের অস্ত্র।

জমকালো মূর্তির কণ্ঠে এমন একটা বলিষ্ঠতা ছিলো যার জন্য রুশদী তার নিজের হাতের রাইফেল খানা ফেলে দিতে বাধ্য হলো।

সঙ্গে সঙ্গে রুশদীর দলবল নিজ নিজ অস্ত্র ফেলে দিলো রুশদীর অস্ত্রের পাশে।

জমকালো মূর্তি এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো, যেখানে দাঁড়ালে সমস্ত ঘরখানাকে আয়ত্বে রাখা সম্ভব হবে। জমকালো মূর্তির হাতের উদ্যত রিভলভার দুটির দিকে তাকালে হৃদয় কেঁপে উঠে। রুশদীও তার সাথীদের অবস্থাও সেই একইরকম হয়ে পড়ে। কে এই জমকালো মূর্তি, হঠাৎ কোথা থেকে বা তার আবির্ভাব।

জমকালো মূর্তি রিভলভার ঠিক রেখে, পা দিয়ে রুশদী ও তার সাথীদের ফেলে দেওয়া রাইফেলগুলো এক একটা নিজের পিছনে সরিয়ে ফেললো।

রুশদী এবং তার সহকারীরা ভীত হয়ে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহই নাই। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে।

জমকালো মূর্তি বললো—তোমরা অর্থের জন্য জীবন বিলিয়ে দেবে। এই তোমাদের শপথ?

রুশদী বললো—হাঁ। কিন্তু বলো কে তুমি?

আমার পরিচয় পরে জানতে পারবে। তোমরা অর্থ চাও, বেশ ভাল কথা, কত অর্থ হলে তোমরা খুশি হও? এক লক্ষ, দু'লক্ষ, তিন লক্ষ....বলো কত চাও?

রুশদীর দু'চোখ গোলাকার হয়, বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে সে, ভাবে লোকটা বলে কি।

জমকালো মূর্তি বলে উঠে—জবাব দিচ্ছোনা কেনো, বলো কত টাকা তোমরা চাও?

তবু নীরব রুশদী।

জমকালো মূর্তি বললো—যত টাকা চাও আমি দেবো তোমাদের। শুধু টাকা নয় সোনা দানা সব কিছু পাবে। তার বিনিময়ে তোমাদের জীবন চাইনা। চাই তোমাদের বাবা মা ভাই বোনদের রক্ত।

চমকে উঠে তাকালো সবাই জমকালো মূর্তির দিকে। রুশদীর চোখে মুখে বিস্ময়।

জমকালো মূর্তির হাতের রিভলভার কোন সময়ের জন্য এতোটুকু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। রিভলভার ঠিক রেখে কথা বলছিলো জমকালো মূর্তি। এবার বললো—পারবে তোমরা, তোমাদের বাবা, মা, ভাই, বোনদের রক্ত দিতে? যদি পারো তবে বলো কত টাকা চাও? চুপ করে থেকোনা।

এবার রুশদী বললো—না; বাবা, মা, ভাই, বোনদের রক্তের বিনিময়ে অর্থ আমরা চাইনা।

চাওনা লক্ষ লক্ষ টাকা, চাওনা সোনা দানা।

না না। সবাই বললো একসঙ্গে।

জানি তোমরা বাঙ্গালী। বাংলার মাটিতে তোমাদের জন্ম। তোমরা কোনদিন পারোনা অর্থের বিনিময়ে বাবা, মা, ভাই, বোনদের রক্ত দিতে। তোমাদের কাছে বুক ভরা মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসা। পারবেনা তোমরা নিজের আপন জনদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে। জমকালো মূর্তি মুখের আবরণ খুলে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে রুশদী ও তার সঙ্গীরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—ক্যাপ্টেন হাসান আপনি......

ক্যাপ্টেন হাসান নই, তোমাদের হাসান ভাই। রিভলভার দু'টো বেল্টের কভারে রেখে সরে আসে, রুশদীর পিঠ চাপড়ে বলে—তোমাদের কথা শুনে সত্যি আমি বড় খুশি হয়েছি। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়েও তোমরা চাওনা আপন জনদের বিসর্জন দিতে। ভাই রুশদী তোমরা বাংলার ছেলে, বাংলার সব মানুষ তোমাদের আপন জন। বাংলার মানুষের সুখ সাচ্ছন্দ তোমাদের নিজেদের সুখ সাচ্ছন্দ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলা জননী আজ সর্বহারা! সে তাকিয়ে আছে তার সন্তানদের মুখের দিকে, তোমরা তারই সন্তান। এখন বাংলা জননীকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলবে তোমরাই। তোমাদের দায়িত্ব অনেক,—দেশ গড়ার পালা এখন তোমাদের। দেশকে সবদিকে সুন্দর সুষ্ঠু করে গড়ে নাও দেখবে তোমাদের বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের মুখে হাসি ফুটেছে! অর্থ তখন তোমাদের পায়ের নিচে গড়াগড়ি যাবে। শপথ গ্রহণ করো—এ অস্ত্র আর তোমরা দুঃস্কর্মের জন্য হাতে তুলে নেবেনা। যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র আবার আপনা আপনি আসবে তোমাদের হাতে। তোমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী তোমাদের অস্ত্র জমা দিয়ে দাও। দেশ গড়ার কাজে

আত্ম নিয়োগ করো। বহুত্যাগ তোমরা দিয়েছো, পারবেনা এবার দেশ গড়ার কাজে আত্মত্যাগ করতে?

রুশদী বলে উঠে—পারবে।

তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সবাই বলে উঠে—পারবো।

হাসানের মুখে হাসী ফুটে উঠে।

এরপর থেকে রুশদীর দলও এসে যোগ দেয় ক্যাপ্টেন হাসানের দলে। কৃষক শ্রমিক মজুর, ছাত্র জনতা, কেউ বাদ দেয়না, সকলে দেশ গড়ায় নেমে পড়ে।

যেখানেই শোনে চুরি-ডাকাতী চলেছে, সেখানেই গিয়ে হাসান জনতার মধ্যে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে। বাংলার মানুষ সর্বস্ব দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছে, কাজেই বাংলার শান্তি রক্ষার ভার বাংলার মানুষেরই উপর রয়েছে। তারা যদি বাংলার স্বাধীনতার মর্যাদা নষ্ট করতে চায়, তাতে ক্ষতি বিদেশের মানুষের হবে না, হবে বাংলার মানুষের।

আরও বহু যুবক দল বিভিন্ন এলাকায় দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারী-পুরুষ সবাই মিলে চলে দেশ গড়ার সংগাম।

রিয়াজ আলীও তার দল-বলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার পর দালাল বাহিনীর লোক যারা এখনও মন-প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারছিলো না তারা নিজেদের মনোভাব পাল্টে নেয়। কারণ জানে তাদের অবস্থাও এমনি হতে পারে।

যে সব রাজাকার এবং বদর বাহিনীর লোক বাংলার মানুষের মধ্যে মিশে আছে, তারা যেন আর কোন রকম বিশ্বাস ঘাতকতা না করে সেজন্য তাদের কাছে অনুরোধ জানায় হাসান।

কিন্তু যারা দুষ্ট লোক তারা কোনদিন সৎবাক্য গ্রহণ করে না। যেমন সাপকে যতই দুধ-কলা দেন না কেনো, সাপ সুযোগ পেলেই ছোবল মারবেই মারবে।

একদিন একটি বদর বাহিনীর লোক, সাধু সেজে ভদ্র লোকের মত, এসে হাজীর হলো ক্যাপ্টেন হাসানের কাছে। সে এসে জানালো, দেশ গড়ার কাজে সে যোগ দিতে চায়।

লোকটাকে অবশ্য সঙ্গে এনেছিলো ফারুক।

ক্যাপ্টেন হাসান লোকটার পা থেকে মাথা অবধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—আপনার মনোভাব জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম, বেশ আপনি যোগ দিতে পারেন আমার দলে। আপনার নামটা কি সাহেব?

নাম......আমার নাম......আলী হায়দার।

হুঁ ভাল। যাও ফারুক একে তোমাদের দলে যোগ করে নাও।

ফারুক সহ চলে গেলো আলী হায়দার।

এমন সময় তাঁবুতে প্রবেশ করলো শামীমা।

হাসান আসন ত্যাগ করে উঠতে যাচ্ছিলো পুনরায় বসে পড়ে বললো—শামীমা হঠাৎ কি মনে করে?

কেনো আমার আসতে নাই বুঝি?

না না তা বলছিনা। বসো।

শামীমা বসে পড়ে।

হাসান বলে—শামীমা সেদিন কি যেন বলবে বলেছিলে?

তোমার মনে আছে এখনও।

থাকবে না, এতো বড় একটা ব্যাপার। বলো, সেদিন কি বলবে বলেছিলে?

না থাক।

উঁ-হুঁ বলতে হবে আজ তোমাকে।

মাথা নিচু করে শামীমা।

হাসান ওর মুখ খানা তোলে ধরে—তোমার কথাটা আমি বলি কেমন?

এবার চোখ তোলে শামীমা।

বলো, বলবো তোমার মনের কথাটা?

ছোট্ট করে বলে শামীমা—বলুন?

সত্যি বলবো?

হ্যাঁ।

তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার বড্ড ভালো লাগে......বলো তোমার মনের কথা বলেছি কিনা?

শামীমার গণ্ড রক্তাভ হয়ে উঠে। চোখ দুটো নিচু করে রাখে সে।

হাসান হাসে, শামীমার মনোভাব সে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলো। শামীমা কারণে অকারণে প্রায়ই তার তাঁবুতে আসতো। ভাবী কোন জিনিষ তৈরি করলে সে লুকিয়ে আনতো হাসানের জন্য। নিজের হাতে শামীমা কতদিন হাসানের মুখে খাবার তুলে দিয়েছে। সরল পল্লী বালিকার ইচ্ছাকে সে বাধা দেয়নি কোনদিন। বরং এতে হাসান আনন্দ লাভ করেছে। হাসান বলে আবার বলো চুপ করে রইলে কেন?

হ্যাঁ।

তোমাকেও আমার খুব ভাল লাগে শামীমা......

হাসানের কথা শেষ হয়না দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে যায় শামীমা। দু'চোখে তার খুশির উচ্ছাস।

পথে এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাকে জড়িয়ে ধরে বলে— জানিস আজ আমার কি আনন্দ।

বান্ধবী অবাক হয়ে বলে—কি বলছিস তুই?

সত্যি। কথাটা খোলাসা না বলেই সোজা সে বাড়ির পথে ছুটে চলে।

বান্ধবী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

হাসান তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পায় তার তাঁবুর পাশ থেকে সরে যায় আলী হায়দার।

হাসান অধর দংশন করে।

রাতে বৈঠক বসে হাসানের।

সেখানে সকলের সঙ্গে আলী হায়দারও ছিলো।

হাসান সবাইকে লক্ষ্য করে বললো—আজ রাতে আমরা হাওলা চরে যাবো। সেখানে কয়েকজন লোক আমাদের জন্য প্রচুর অর্থ এবং সোনা নিয়ে অপেক্ষা করবে। এরা একদল মুক্তিযোদ্ধা বেশী ডাকাত দল। ওরা আত্মসমর্পণ করবে বলে জানিয়েছে।

হীরা আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললো—এ সংবাদ অতি খুশির সংবাদ। কিন্তু যদি কোন চক্রান্ত থাকে এর পেছনে।

সেও তো আনন্দের কথা হীরা। চক্রান্তকারী ডাকাত দলকে সায়েস্তা করার সুযোগ পাবো। কিন্তু আমার মনে হয় এরা কোন চক্রান্তকারী নয়;

গভীর রাতে হাসান দলবল নিয়ে হাওলা চরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। কিন্তু আলী হায়দার কই। সে কখন তাদের দল থেকে সরে পড়েছে।

হীরা আশঙ্কা প্রকাশ করলো।

হাসলো হাসান।

হাসানের হাসির মানে কেউ তখন ঘুঝতে পারলো না।

হাওলা চরে পৌছবার পূর্বে হাসান সবাইকে বললো—তোমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকবে এবং তোমরা কেউ হাওলা চরে যাবেনা। আমি একা যাবো, যখন পর পর তিনটা গুলি ছুড়বো তখন তোমরা নৌকায় চেপে ওপারে যাবে।

হাসান এবার অন্ধকারে এগুলো।

দূরে হাওলা চর।

হাওলা নদীতে অনেকগুলো নৌকা বাঁধা ছিলো, হাসান সেই নৌকার একখানাতে চেপে বসলো। নিজেই বৈঠা চালিয়ে অল্পক্ষণে ওপারে পৌঁছে গেলো।

তীরে নেমে দাঁড়াতেই সা করে একটা গুলি চলে গেলো তার কানের পাশ কেটে।

হাসান সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীরে বালুর মধ্যে উবু হয়ে শুয়ে পড়লো। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে কঠিন বলিষ্ঠতার ছাপ।

বুকে ভর করে দ্রুত এগোয় হাসান। গুলিটা আসায় তার পক্ষে ভাল হয়েছে কারণ সে বুঝতে পারলো, কোন দিকে তাকে এগুতে হবে।

জমাট অন্ধকার।

হীম শীতল বাতাস বইছে।

হাসান আজ দুপুরে তাঁবুতে যখন বিশ্রাম করছিলো তখন একটা ছোট্ট ছেলে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলেছিলো—একটা লোক এটা দিয়েছে।

হাসান চিঠিখানা খুলে পড়ে দেখে, তাতে লিখা আছে—

ক্যাপ্টেন হাসান,

হাওলা চরে আসবেন।
আমরা একদল ডাকাত আপনার
কাছে আত্মসমর্পণ করবো। আমরা
আমাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত।

সর্দার ডাকাত।

হাসান যখন হাওলা চরের মাঝামাঝি পৌঁছে গেলো তখন সে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে একজন লোক একটা উঁচু টিলার উপরে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসান একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ করে লোকটা পড়ে গেলো।

মাত্র এক মিনিট পর পরই প্রায় দশ-বারো জন লোক সেই জায়গায় ছায়ার মত বেরিয়ে এলো। এরা এতোক্ষণ চরের মধ্যে ঝোপ ঝাড়ের পাশে লুকিয়ে ছিলো।

হাসান যে জায়গায় আত্মগোপন করেছিলো সেদিকটা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক, কাজেই ডাকাত দল তার উপস্থিতি বুঝতে পারলো না।

হাসান একটির পর একটি ঘায়েল করে চললো।

শুধু আর্তনাদ ভেসে আসছে হাওলা চর থেকে নদীর বুকে। নদীর পানিতে কেঁপে কেঁপে ভাসছে শব্দটা।

হাসানের লক্ষ্য নিপুন, একটি গুলিও তার বিফল হয়না। ডাকাত দল ভেবেছিলো, হাসানের দলকে ভুলিয়ে এনে তাদের হত্যা করবে, কিন্তু হাসানের হাতে বেশ কয়েকজন নিহত হবার পর, ওরা বুঝতে পারলো পরাজয় তাদের আসন্ন। তখন সবাই পালাতে শুরু করলো।

নৌকায় চেপে বসতেই হাসান ফাঁকা তিনটা গুলির আওয়াজ করলো।

অমনি হাসানের দলবল নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে যখন দেখতে পেলো, একদল লোক রাতের অন্ধকারে নৌকা বেয়ে পালাচ্ছে, তখন তারা গুলি ছুড়তে শুরু করলো।

এদিকে হাসানও গুলি ছুড়ছে। হাসানের গুলিতে আরও কয়েকজন নিহত হলো।

ওরাই পাল্টা গুলি ছুড়ছে কিন্তু পলাতক ডাকাত দলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে সব।

প্রায় সমস্ত রাত ধরে চলে হাসানের দল আর হাওলা চরের ডাকাত দলের গুলি বিনিময়। ভোর রাতে মাত্র তিনজন জীবন্ত ডাকাত ধরা পড়ে যায় ক্যাপ্টেন হাসানের হাতে।

ভোরের আলোতে ওরা স্পষ্ট দেখলো এই ডাকাত দলের অধিনায়ক সর্দার ডাকাত হলো আলী হায়দার নিজে।

আলী হায়দার যেদিন প্রথম গিয়ে হাসানের দলে যোগ দেয়, সেদিনই হাসান তাকে বুঝতে পারে এ লোকটা সাধারণ লোক নয় এবং সে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই যে তাদের দলে প্রবেশ করেছে এটাও সত্য। হাসান এরকম একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলো।

আলী হায়দার ও তার জীবন্ত সঙ্গী দুইজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো হলুদখালী ঘাটিতে। তারপর প্রকাশ্যে তাদের মাথা নেড়ে করে, মুখে চুন কালি মাখিয়ে, শহরে হাজতে পাঠিয়ে দিলো।

একটা দুধর্ষ ডাকাতদল ধ্বংস হলো।

এবার হাসান মনোযোগ দিয়ে অসৎ ব্যবসায়ী যার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত রেখে বাজারে অগ্নিমূল্য সৃষ্টি করেছে।

তার দলের তরুণ ছেলেদের ছাড়িয়ে দিলো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়। কার গোপন গুদামে কত জিনিষ মওজুত আছে জেনে নিয়ে তাকে জানাবে।

এবার শুরু হলো মজুতকারী দুষ্কৃতিকারীদের সায়েস্তা করার পালা। বঙ্গবন্ধুর আদেশ অমান্য করে যে সব ব্যবসায়ী প্রচুর লাভের জন্য জিনিস গোপনে লুকিয়ে রেখেছে তাদের জিনিস গোপন স্থান থেকে টেনে বের করে আনতে হবে।

হাসান নিজেও এক কাজে ঝাপিয়ে পড়লো।

হাসান কিন্তু ইতিপূর্বেই তার কয়েকজন সঙ্গীকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে বাংলাদেশের কাজ শেষ করেই চলে আসবে পশ্চিম পাকিস্তানে। শত শত বাঙ্গালী নারী পুরুষ আজ সেখানে আছে। তারা কি অবস্থায় আছেন বা আছে সঠিক কেউ জানে না। তবে তাদের জীবন যে এক ভয়ানক অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাসান বাংলাদেশের কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে স্মরণ করছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী বাঙ্গালীদের কথা।

❑

ঢাকার কোন এক গলির মধ্যে প্রবেশ করলো একটা ট্যাক্সি। ড্রাইভ আসনের পাশে বসে এক ব্যক্তি, তার মাথায় টুপি, আচকান আর পা-জামা পরা।

গাড়ির চালকের মাথায় একটা ক্যাপ। ক্যাপ দিয়ে তার মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা।

টুপি পরা লোকটা ড্রাইভারকে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি রাখতে বলে।

বাড়িটা তেমন অট্টালিকা নয়, ভাঙ্গাচুরা একটি কারখানা ধরণের মনে হয়। ড্রাইভার গাড়ি রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে টুপি পরা লোকটা নেমে পড়লো।

ড্রাইভার তার ছোট্ট এটাচী ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললো—চলুন পৌছে দিয়ে আসি স্যার।

টুপি পরা লোকটা তার বিপুল দেহ নিয়ে নড়াচড়া করতে অসুবিধা হওয়ায় সে ড্রাইভারকে বলে—এগিয়ে এসো।

লোকটা দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে দেয় একটা ছোকরা বলে—সেলাম স্যার।

লোকটা একটু মাথা দোলায় তারপর ভিতরে প্রবেশ করে। পিছনে পিছনে ড্রাইভারও প্রবেশ করে।

ছোকরা মনে করে সাহেবের ড্রাইভার কাজেই তাকে বারণ করে না। সোজা ওরা চলে যায় ভিতরে।

ছোকরা দরজা বন্ধ করে দেয়।

ভিতরে প্রবেশ করতেই কয়েকজন কর্মচারী ধরণের লোক, টুপি পরা বিপুল দেহী লোকটাকে ওরা ছালাম জানালো তারপর এগিয়ে চললো তার পিছনে সবাই।

বাইরে থেকে বাড়িটা ভাঙ্গাচুরা কোন কারখানা মনে হলেও ভিতরটা অদ্ভুত। ছোট ছোট গুদাম ঘরের মত বহু ঘর। লোকটা প্রত্যেকটা ঘরে প্রবেশ করে মাল পরীক্ষা করে দেখলো। কোন গুদামে হাজার হাজার মণ চাউলের বস্তা সাজানো রয়েছে, কোন গুদামে বস্তা বস্তা চিনি। কোনটায় নারিকেল তৈল টিন-টিন ভর্তি।

বাজারে মাল নেই অথচ গুদামে মাল ধরছে না। গোপনে কিছু কিছু মাল এখানে সেখানে চালান যাচ্ছে বটে কিন্তু অগ্নি মূল্যে।

মালিক গুদামগুলো পরীক্ষা করে অফিস রুমে এসে বসলো। কয়েক জায়গায় ফোন করলো, আলাপ হলো মাল বিক্রি কিনি নিয়ে। বাংলাদেশ সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে এমনি আরো কত ব্যবসায়ী যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে চরম এক অবস্থার সম্মুখে ফেলেছে।

রাত বেড়ে গেলো হিসাব নিকাশ দেখতে।

একে একে চলে গেলো কর্মচারীগণ।

কয়েকজন পাহারাদার ও মালিক রইলো তখনও সেখানে।

এবার মালিক উঠে দাঁড়ালো—

ওপাশে একটা টুলের উপর বসে বসে ঝিমুচ্ছে ড্রাইভার।

মালিক বললো—ড্রাইভার এবার চলো।

হাইতুলে উঠে দাঁড়ালো ড্রাইভার।

পরদিন দেখাগেলো বিপুল দেহ বিশিষ্ট মালিক তার চালের গুদামের মেঝেতে চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে আছে। সমস্ত দেহের উপর সারি বদ্ধ ভাবে সাজানো রয়েছে বেশ কয়েক বস্তা চাল। জিভটা বেরিয়ে এসেছে মুখের ভিতর থেকে। চোখ দুটো ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পায়খানা দ্বার দিয়ে পেটের নাড়ী ভুরি বেরিয়ে পড়েছে।

সকলের চক্ষুস্থির। এ যেন এক ভুতুড়ে ব্যাপার।

সমস্ত শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে ভীষণ ভাবে কানা-ঘুষা চললো।

দু'দিন পর দেখা গেলো আরও একটি চোরা কারবারী তার শয়ন কক্ষে টাকার সিন্দুকের মধ্যে মাথা গুঁজে মরে আছে। মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে টাকা গুলোর উপরে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

ঠিক দু'দিন পর আর একজন কারবারী লোক তার তৈলের গুদামে একটা ড্রামের মধ্যে মাথাটা নিচে পা মুখখানা আকাশের দিকে তুলে জান্নাত বাসী হয়েছেন।

সমস্ত শহরে একটা আতঙ্ক ভাব ছড়িয়ে পড়লো। ব্যবসায়ী মহলের মুখ চুন। যে সব ব্যবসায়ী ভবলীলা সাঙ্গ করলেন তাদের প্রত্যেকটা লোক মুনাফাকারী জাদরেল ব্যবসায়ী।

বড়দের অবস্থা দেখে ছোট খাটো ব্যবসায়ীরা কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেলো। সকলের মুখেই কালি পড়ে গেছে।

এবার বাজারে জিনিস বেরুতে শুরু করলো। ব্যবসায়ীরা আর মাল গুদামজাত করে রাখার সাহসী হলোনা। না জানি কখন তার ভাগ্যে কি ঘটে।

ব্যাপারটা প্রথমে শহরে শুরু হলেও গ্রামে বন্দরেও শুরু হলো। পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, এ সব যেন নিত্য নতুন ঘটনা।

হলুদ খালি ক্যাম্পে সেদিন এ ব্যাপার নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে।

অদূরে একটা খাটিয়ায় অৰ্দ্ধ শায়িত অবস্থায় একখানা বইএর পাতা উল্‌টাছিলো ক্যাপ্টেন হাসান। হীরা বললো—হাসান ভাই দেখেছো আজ

রাতে ময়না পুর বন্দরের কাছে এক ব্যবসায়ী তার মাল গুদামে চিনির বস্তার মধ্যে মুখ গুঁড়ে মরে আছে। আশ্চর্য পরপর এমনি প্রায়ই এখানে সেখানে ঘটছে। কে-বা কারা ওমন কাজ করছে?

খলিল বলে উঠলো—না জানি কোন মহৎ ব্যক্তির এ কাজ নিশ্চয়ই কোন দল ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা ব্রত গ্রহণ করেছে।

হাসান এতোক্ষণ শুনছিলো ওদের কথাগুলো। এবার হীরার প্রশ্নের উত্তর দেয়—হুঁ শুনলাম।

হীরা বললো—আশ্চর্য বটে।

হাসান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—আশ্চর্য মোটেই নয়, কারণ যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনি ফল পাবে। বঙ্গবন্ধু বললেন এক সপ্তাহের মধ্যে বাজারে জিনিসের দাম কমিয়ে ফেলতে হবে। তাঁর কথা শুনে ব্যবসায়ী মহলের পিলে চমকে গেলো। মুখে কালি পড়লো কিন্তু কেউ কি মাল ছাড়লো? খোলা বাজারে যা ছিলো তাও চোরা গুদামে উঠে পড়লো। এই সব ব্যবসায়ীরা মুখের কথায় সায়েস্তা হবেনা তাই হয়তো কেউ তাদের সায়েস্তা স গ্রামে মনোযোগী হয়েছে।

ঠিক বলেছেন হাসান ভাই, মুনাফাকারী ব্যবসায়ীরা যদি ভাল মানুষের মত ভালয় ভালয় জিনিস গুদাম থেকে বের না করে, তাহলে এই ভাবেই তাদের সায়েস্তা করতে হবে।

খলিল বলে উঠলো—অনেক ব্যবসায়ী আছে তারা এমন গোপন মাল লুকিয়ে রেখেছে যা খুঁজে বের করা মুস্কিল।

হাসলো হাসান—জনগণের চোখকে ফাঁকি দেওয়া আর সম্ভব নয়। তারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছে, এ স্বাধীনতাকে তারা অন্যায় অবিচারে বিনষ্ট করতে দেবেনা। কাজেই যেখানে যে ব্যক্তি যাই অন্যায় করুক না কেনো, তাকে সমুচিত শাস্তি পেতেই হবে। শুধু ব্যবসায়ী মহলই নয়, চাকুরী জীবী, যারা নিত্য নতুন পয়সার লোভে ঘুষ খাবে, তাদের অবস্থাও কাহিল হবে। পয়সা দিয়ে জনগণ কাজ হাসিল করিয়ে নেবে না, যদি কোন ব্যক্তি কাজ করে দেবে বলে পয়সা চায় তার টুটি ধরে টেনে আনবে পথের ধুলায়। তারপর বিচার করবে জনগণ। হাঁ আরও একটা কথা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সাহায্যার্থে বিদেশ থেকে বহু রিলিফ দ্রব্য আসছে। বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষদের বাঁচানোর জন্য বিদেশের এই সাহায্যদান।

বলে উঠে মাসুদ—হাসান ভাই, সেদিন সংবাদপত্রে দেখলাম কোথাও কোথাও সাহায্য দ্রব্যাদি রিলিফ কর্মকর্তাগণ আত্মসাৎ করে চলেছে।

সত্যি এ কথা চিন্তা করতেও ঘৃণা হয়। বাংলার মানুষের জন্য বিদেশীরা দয়া পরবশ হয়ে এ সব রিলিফ সাহায্য পাঠাচ্ছে। বাংলার মানুষ যেনো না খেয়ে মরে না। আর দেখো, সেই সব সাহায্য দ্রব্য রিলিফ কর্মকর্তারা কিভাবে হজম করে নিচ্ছে। কথাটা কিন্তু বাংলাদেশেই চাপা থাকবেনা। বাইরের দেশ গুলিতে ও ছড়িয়ে পড়বে। ভেবে দেখো এটা কত বড় লজ্জার কথা। হ্যাঁ এই ধরনের রিলিফ আত্মসাৎকারী ব্যক্তিদের কিছুতেই ক্ষমা করা উচিৎ হবেনা। এটা শুধু অপরাধ নয়, চরম দোষণীয় ব্যাপার। বাংলার লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের মুখের গ্রাস এ ভাবে হজম করবে, এক দল মানুষ নামি পশু......হাসান কথার ফাঁকে দাঁতে দাঁত পিষলো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো—রিলিফ দ্রব্য চুরি, এর মত জঘন্যতম ঘৃণার কাজ আর কিছু নেই। এরা মনে করে আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই তো জিনিস গুলো সরিয়ে ফেলছি, বাইরের লোক টের পাবে না। কিন্তু তারা জানেনা পাপ কোন দিন চাপা থাকে না।

হাসানের কথাগুলো প্রতিটি যুবকের ধমনির রক্তে আলোড়ন তুললো। সত্যি এই সব লোকদের কিছুতেই ক্ষমা করা চলবেনা। প্রতিটি জনগণকে সজাগ সর্তক হতে হবে। রিলিফ দ্রব্য প্রচুর আসছে, বাংলার যুদ্ধ বিধ্বস্ত অসহায় মানুষদের জন্য। সে গুলি ঠিক মত সকলে পাচ্ছে কিনা। বিশেষ করে জনগণকে এ ব্যাপারে বেশি খেয়ালী হতে হবে।

হাসান বললো—বঙ্গবন্ধু বলেছেন শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ে তোল। বাংলার সব মানুষকে হুঁশিয়ার হতে হবে, নিজেরা অন্যায় করবেনা, অন্যায়কেও ক্ষমা করবেনা তারা। তাহলেই সোনার বাংলা সুখ শান্তিতে ভরে উঠবে। একটু থেমে বললো হাসান—আজ একটা কথা তোমাদের বলবো। সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকালো হাসানের মুখের দিকে।

হাসান বললো—তোমরা সবাই আছে এখানে?

হীরা সকলের দিকে তাকিয়ে বললো—শামীমা ছাড়া আমরা সবাই আছি হাসান ভাই।

হুঁ। একটু শব্দ উচ্চারণ করে বললো হাসান—বাংলাদেশের মানুষ তোমরা। তোমাদের কর্তব্য বাংলার স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে বজায় রাখা। বাংলার মানুষ প্রত্যেকেরই সজাগ থাকতে হবে, দেশ কি করে আদর্শ

সার্বভৌম দেশ হিসাবে গড়ে উঠে, সেই চেষ্টা করতে হবে। না হলে বঙ্গবন্ধুর মহৎ মহান আদর্শ নেতা হয়েও তিনি একা গোটা বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারবেন না। বাংলার প্রতিটি মানুষকে হতে হবে মহৎ। বিশেষ করে তাঁর সহকর্মী মহলকে সর্বদিকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। দেশের নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি আদর্শবান হন, তাহলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে। তাঁদের আদর্শ নিয়েই গড়ে উঠবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষ। আর যদি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গলদ থাকে, তাহলে কোনকালেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে না। মুখে তারা যতই সাধু সাজতে চান জনতার কাছে আত্ম প্রকাশ পাবেই এবং জনতা তাদের রেহাই দেবে না। একটু থেমে বললো আবার সে—আশা করি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তথা কথিত পাকিস্তানের নেতাদের অবস্থা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, কাজেই হয়তো তেমন মহা ভুল আর এঁনারা করবেন না। আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয় তেমনি চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির শাসনে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলার প্রতিটি মানুষ সজাগ হয়েছেন, তাই মনে হয় বাংলার নেতাগণ খাঁটি মানুষই হবেন। হাঁ একটা সমস্যা এখন বাংলার মানুষের ভাবনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে হলো পশ্চিম পকিস্তানের বাঙ্গালী সমস্যা, এরা সেখানে কি ভাবে আছে সঠিক কেউ জানিনা। সেখানে পশ্চিমা শাসক গোষ্টি বাঙ্গালীদের উপর ইচ্ছামত আচরণ করে চলেছে। অনেক বাঙ্গালীকে তারা ধরে নিয়ে যায় কিন্তু কোথায়, নিয়ে যায় কেউ জানেনা। তারা ফিরেও আসেনা আর। যে সব পরিবার থেকে তাদের কর্মদক্ষ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের অবস্থা একবার ভেবে দেখো। আরও একটা সংবাদ আমাকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে, সে হলো পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙ্গালী মেয়েদের নাকি ধরে নিয়ে গিয়ে গোপনে বিদেশে বিক্রি করা হচ্ছে—কথাটা শেষ না করেই থামলো হাসান, তার চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো। দারুণ ক্রুদ্ধভাব তার ভিতরে ফুলে ফুলে উঠছে। উপরের দাঁতগুলো দিয়ে নিচের ঠোঁট খানাকে কাঁমড়ে ধরলো হাসান, হয়তো নিজকে সংযত করে নেবার চেষ্টা করছে সে।

বিস্ময় ভরা চোখে ক্যাপ্টেন হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। অদ্ভুত মানুষ এ হাসান ভাই।

পরদিন সকালে শামীমা এসে হাজির, আজ সে অনেক কথা নিয়ে এসেছে। বলবে শামীমা হাসানের কাছে। দু'চোখ তার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

আজ বেশ বেলা হয়ে গেছে তবু উঠেনি হাসান।

অন্যান্য ছেলেরা সবাই উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছে। প্রতিক্ষা করছে সবাই তাদের হাসান ভাইএর। সে এলে সবাই মিলে নাস্তা খাবে।

শামীমা হাসানের তাবুতে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায়। বিছানা শূন্য পড়ে আছে হাসান নেই। তাকায় সে পাশের দড়িতে যেখানে ওর জামাটা ঝুলতো। জামাও নেই এমন কি জুতোও নেই তার।

হঠাৎ শামীমার দৃষ্টি পড়লো বিছানার পাশে একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে, শামীমা কাগজখানা হাতে তুলে নিতেই হীরা ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তরুণ তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করে।

শামীমার হাতে একটি কাগজ অথচ তাঁবুর মধ্যে হাসান ভাই নাই। হীরা এগিয়ে যায়, বলে—শামীমা হাসান ভাই কোথায়?

শামীমা অশ্রু ছল ছল চোখ দু'টো তুলে তাকায় কোন জবাব দেয়না, শুধু হাত বাড়িয়ে কাগজখানা হীরার হাতে দেয়।

হীরা কাগজখানা পড়তে থাকে—প্রিয় ভাইয়েরা
—জানি তোমরা আমাকে খুঁজবে।
কিন্তু আমি এখন অনেক দূরে।
আর কোনদিন তোমাদের
মধ্যে ফিরে আসবো কিনা জানিনা।
তোমাদের ভালবাসা চিরদিন স্মরণ
থাকবে। হাঁ একটি কথা তোমাদের
অজ্ঞাতে আমাকে অনেক কাজ করতে
হয়েছে। দালালদের সায়েস্তা আমিই
করেছিলাম। ব্যবসায়ী মহলে আমি
আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলাম। উপযুক্ত
সাজা দিয়েছি যে যেমন কাজ করে-
ছিলো তেমনি। পশ্চিম পাকিস্তানের

বাঙ্গালীদের মুক্তির জন্য এখন আমার
সংগ্রাম চলবে। শামীমাকে আমার
ভালবাসা জানাবে। তোমরা আমাকে
হাসান ভাই বলেই জানো কিন্তু
আমার আসল পরিচয় তোমরা
জানোনা। আজ তোমাদের আমার
আসল পরিচয় জানালাম।
তোমাদের শুভাকাঙ্খী—

দস্যু বনহুর

হীরার চিঠি পড়া শেষ হতেই একসঙ্গে সবাই চিৎকার করে বলে উঠলো—হাসান ভাই দস্যু বনহুর!

হীরার দু'চোখ তখন অশ্রু ছল ছল করছে, বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে—হাসান ভাইএর আচরণেই আমি বুঝতে, পেরেছিলাম নিশ্চয়ই সে অন্যান্য সকলের মত সাধারণ মানুষ নন। তার প্রতিটি কথা হৃদয় স্পর্শ করতো। তার বলিষ্ঠ দীপ্ত চেহারা সবাইকে মন্ত্র মুগ্ধের মত আকৃষ্ট করতো। তার প্রতিটি কার্যকলাপ মানুষের মনে বিস্ময় জাগাতো......